ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

ডিসেম্বর ২০১৬ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ৩০

বিশেষ সংখ্যা

বিকাশের জন্য বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে সরকারের যোগদান
আশুতোষ শর্মা

প্রতিরক্ষা গবেষণা : লক্ষ্য জাতীয় বিকাশ
ড. জি. সতীশ রেড্ডি

জাতির সেবায় পরমাণু শক্তির সদ্ব্যবহার
কে. এন. ব্যাস এবং এম. রমণমূর্তি

ভারতে কৃষি বিজ্ঞান গবেষণা : আর্থ-সামাজিক সুফল
শান্ত কুমার *এবং* সুরেশ পাল

বিশেষ নিবন্ধ

মহাকাশ এবং মানবসমাজ
জি. মাধবন নায়ার

ফোকাস

শিক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : এক উপায় এবং এক উদ্দেশ্য
রাজারাম এস. শর্মা

সুরক্ষিত গর্ভধারণ—একটি সামাজিক আন্দোলন

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানের সূচনা করা হয়। এর উদ্দেশ্য সুরক্ষিত গর্ভধারণ ও সুরক্ষিত প্রসবের মাধ্যমে প্রসূতি ও নবজাতক মৃত্যুহার কমিয়ে আনা। এই রাষ্ট্রীয় প্রকল্প সারা দেশজুড়ে প্রায় ৩ কোটি মহিলাকে বিনামূল্যে বিশেষ প্রাক্-প্রসব পরিচর্যা প্রদান করবে, যাতে সময় মতো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

এই জাতীয় প্রকল্পে প্রত্যেক মাসের ৯ তারিখে অন্তঃসত্ত্বাদের জন্য উচ্চমানের সামগ্রিক গর্ভাবস্থাকালীন পরিচর্যা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় ত্রৈমাসিকে তারা যে কোনও সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের কাছে বিশেষ Check-up-এর জন্য যেতে পারেন। এই কর্মকাণ্ডে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে শামিল হচ্ছেন বেসরকারি ডাক্তাররাও। শহরে ও গ্রামে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়মিত প্রাক্-প্রসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি আল্ট্রাসাউন্ড এবং রক্ত ও মূত্র পরীক্ষাও করা হবে। প্রকল্পের আরেকটি লক্ষ্য হল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ চিহ্নিত করে সঠিক পরিচর্যা প্রদান করার মাধ্যমে প্রসূতি ও নবজাতক মৃত্যুহার হ্রাস করা।

যেসব মহিলা প্রাক্-প্রসব পরিচর্যার সুযোগ পাননি বা তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি, এই প্রকল্পে তাদের উপরও বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানের আওতাধীন কেন্দ্র/ক্লিনিকে সব অন্তঃসত্ত্বাই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা এবং আয়রন, ফলিক অ্যাসিড ও ক্যালশিয়াম-এর মতো ওষুধ পাবেন বিনা খরচে।❑

উদ্যোগপতি হওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে দিশারি প্রকল্প

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রক উদ্যোগপতি হওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে প্রধানমন্ত্রী যুবা যোজনার সূচনা করে।

এই প্রকল্পের মেয়াদ পাঁচ বছর (২০১৬-'১৭ থেকে ২০২০-'২১)। মোট ব্যয় ৪৯৯.৯৪ কোটি টাকা। ৩০৫০-টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাঁচ বছরে ৭ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এতে অনায়াসে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পৃষ্ঠপোষকতা, ঋণ প্রদান করার পাশাপাশি যুবাদের নতুন পথ দেখাতে উন্মেষণ, ত্বরণ ও প্রচারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী যুবা যোজনা দেশে উদ্যোগপতিদের সংখ্যা বাড়ানোর কর্মসূচি। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ভাবী উদ্যোগপতিদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সর্বোত্তম পদ্ধতি এর জন্য অবলম্বন করা হয়েছে।

Massive Open Online Courses (বিপুল মুক্ত অনলাইন কোর্স)-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী যুবা যোজনার আওতায় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানের মতো ২২০০-টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩০০-টি স্কুল, ৫০০-টি ITI ও ৫০-টি Entrepreneurship Development Centre (উদ্যোগ বিকাশ কেন্দ্র) আনা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ২.০ (২০১৬-২০২০)-র আওতায় রাজ্যের ভূমিকা সংক্রান্ত নীতি-নির্দেশিকাও প্রকাশিত হয়। আর্থিক সাহায্য, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নজরদারিতে রাজ্য সরকারের কী কী করণীয়, তার রূপরেখা এই নির্দেশিকা।

সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণাগারের উপকরণের সম-মান সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রক সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ করে। একটি গবেষণাগারে ক'টি কাজ করা যাবে, গবেষণাগারের আদর্শ নক্শা কেমন হবে এবং কোন কোন উপলব্ধ ব্র্যান্ড-এর উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে—এসব এতে নির্দিষ্ট। শিল্পক্ষেত্রের মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য সুনিশ্চিত করে এই নির্দেশিকা রাজ্য-নির্বিশেষে সব প্রশিক্ষিত প্রার্থীরই নিয়োগযোগ্যতা বাড়ানোর পথ প্রশস্ত করবে।

এই প্রথমবার দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রক ৩০ বছরের কম বয়সী প্রথম প্রজন্মের সফল উদ্যোগপতিদের জন্য National Entrepreneurship Award নামক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ঘোষণা করে। অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের তরুণ উদ্যোগপতিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে আগামী ১৬ জানুয়ারি।❑

ডিসেম্বর, ২০১৬

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে সরকারের যোগদান — আশুতোষ শর্মা ৫
- প্রতিরক্ষা গবেষণা : লক্ষ্য জাতীয় বিকাশ — ড. জি. সতীশ রেড্ডি ১০
- জাতির সেবায় পরমাণু শক্তির সদ্ব্যবহার — কে. এন. ব্যাস ও এম. রমণমূর্তি ১৪
- ভারতে কৃষি বিজ্ঞান গবেষণা : আর্থ-সামাজিক সুফল — শান্ত কুমার এবং সুরেশ পাল ২২
- বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ভারতে কৃষি বিকাশ — ড. বঞ্জুল ভট্টাচার্য ২৮
- পরিবেশ সুরক্ষা এবং সুস্থায়ী বিকাশ : হাত ধরতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির — সুদীপ্ত চ্যাটার্জি ৩২

বিশেষ নিবন্ধ

- মহাকাশ এবং মানবসমাজ — জি. মাধবন নায়ার ৩৮

ফোকাস

- শিক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : এক উপায় এবং এক উদ্দেশ্য — রাজারাম এস. শর্মা ৪৪

অন্যান্য নিবন্ধ

- কলম্বিয়ায় যুদ্ধ শান্তি, হয়তো — ড. কিংশুক চট্টোপাধ্যায় ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৫১
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৫২
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৫৪
- জানেন কি? — সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা ৬৬

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান : ভাবীকালের স্লোগান

*"বিজ্ঞান কোনও দেশের সীমায় আবদ্ধ থাকে না; কারণ, জ্ঞান গোটা মনুষ্যজাতির সম্পত্তি; এবং সেই মশাল, যার আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হচ্ছে।"—**লুই পাস্তুর।***

মানবসভ্যতার অগ্রগতি এবং প্রগতির পেছনে মূল কারিগর বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা এবং কৌতূহল। তা সে আগুনের আবিষ্কার হোক বা চাকার আবিষ্কার অথবা নিউক্লীয় সংযোজনের মাধ্যমে শক্তির উদ্ভাবন। যেহেতু কেবল বিজ্ঞান মনস্কতাই পরিস্থিতির সম্যক অনুধাবনের মাধ্যমে সমাধানসূত্র খুঁজে বের করতে সক্ষম; তাই মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হলে নিজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে হবে, অনুসন্ধিৎসু মন তৈরি করতে হবে। আপেল কেন গাছ থেকে নিচে পড়ছে, উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে না—এ বিষয়ে নিউটনের মনে প্রশ্ন না জাগলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার হ'ত না।

বিজ্ঞান কিন্তু কেবল বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনার বিষয়বস্তু নয়; সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলে এমন বিবিধ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের মাধ্যমেই সার্থক রূপ পায় বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে, প্রতিটি আবিষ্কারই স্থায়ী সুফলদায়ী। আইনস্টাইন যেমন বলেছেন, "আজকের বিজ্ঞানই আগামী দিনের প্রযুক্তি।" উন্নয়নের সঙ্গে প্রযুক্তির গাঁটছড়া বরাবরের। বিশেষ করে আজকের দিনের জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতিতে বিকাশের প্রাথমিক পূর্ব-শর্ত হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করবে, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপন করবে তার পন্থা-পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে চলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। বিদ্যুৎ, দ্রুতগামী যানবাহন এবং আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থার মতো বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার দৌলতে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন সহজতর হয়েছে, জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছে। কারণ তারা পড়াশোনার জন্য বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করছে, কাজকারবারের প্রয়োজনে দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্যত্র পৌঁছাতে পারছে, বিপর্যয় সম্পর্কে আগে থেকেই সতর্ক হতে পারছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনাগুলি তরুণ উদ্যোগপতিদের নিজেদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে এবং নতুন নতুন উদ্যোগ স্থাপনে সাহায্য করছে। ভারত এককালে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে বাধ্য হ'ত। সবুজ বিপ্লবের দৌলতে আজ সেই ভারতই খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি করছে। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনাসমূহ কৃষিজীবীদের কম সময়ে উন্নত মানের শস্যের ফলনে সহায়তা করায় খাদ্যের ঘাটতি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে।

যোজনা

চিকিৎসক সমাজের হাতে তথ্য সংগ্রহ, সেই তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কঠিন রোগব্যাধির চিকিৎসার জন্য সাজসরঞ্জাম তুলে দিয়ে বিভিন্ন শাখার বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা মানুষের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে। সাধারণ ছানি কাটানো থেকে শুরু করে জটিল হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন, চিকিৎসা প্রযুক্তি ক্ষেত্রের এই সব যাবতীয় অগ্রগতি মানুষের জীবনযাপনের মনোন্নয়ন তথা আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। দূর দূর এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের দোর গোড়ায় শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিয়েছে প্রযুক্তির প্রসার। 'Digitigation'-এর দৌলতে একদিকে বাচ্চারা প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণের নাগাল পাচ্ছে সহজেই। অন্যদিকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিত্তাকর্ষক উদ্ভাবনার সৌজন্যে একঘেঁয়ে শ্রেণীকক্ষ তথা ব্ল্যাকবোর্ডের উপর লেখার মতো ব্যবস্থাদি অতীত হতে চলেছে। বিশ্ব এখন উন্মুক্ত, অবারিত হয়ে এই সব বাচ্চাদের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য উদ্ভাবনাগুলিও সামাজিক বিকাশের কাজে এবং অসামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, অতি উচ্চতায় চাষাবাদ পদ্ধতি, একসাথে একের অধিক কীট প্রতিরোধক সরঞ্জাম, খাদ্যে বিষক্রিয়া নির্ণায়ক কিট ইত্যাদি প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিকাশ কর্মসূচির সূত্রে উদ্ভাবিত এমন কিছু জিনিস, যার প্রয়োগ অসামরিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক হারে হয়ে আসছে। মহাকাশ প্রযুক্তির প্রসঙ্গে বলা যায়, টেলি-এডুকেশন এবং টেলি-মেডিসিনের মতো প্রয়োগ কর্মসূচির দৌলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব বিস্তারের নিরিখে ভারতকে শীর্ষস্থানে রাখা যায়। পরমাণু প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। হিরোসিমা ও নাগাসাকির অভিজ্ঞতা 'পারমাণবিক শক্তি' শব্দবন্ধকে অভিধানের সবচেয়ে ভীতিজনক শব্দ বলে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু ধন্যবাদ দিতে হয় সেই বৈজ্ঞানিককূলকে যাদের প্রচেষ্টায় আজ নিউক্লীয় শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে শান্তিপূর্ণ কাজে। স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ/সংরক্ষণ, বিদ্যুৎ—এমন কয়েকটি ক্ষেত্র, যা নিউক্লীয় উদ্ভাবনার দৌলতে বিপুলভাবে উপকৃত হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের জীবনে এক বরদান হিসাবে প্রমাণিত। যে জাতি বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহদান করে না, সে বিকাশের দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে। 'উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান' আজ তাই ভাবীকালের স্লোগান।❑

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে সরকারের যোগদান

*বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতির সাথে দেশের সার্বিক বিকাশের প্রশ্নটি সরাসরি জড়িত। তাই দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রকে মজবুত করে গড়ে তুলতে সরকারের তরফে বহু উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে এবং পুরো ব্যাপারটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি করে থাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরকারের তরফে যেসব বড়োমাপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তথা আগামী দিনে কোন পথে এগোতে হবে—তা নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন—***আশুতোষ শর্মা***

আমাদের দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রকে মজবুত করে গড়ে তোলার জন্য সরকারের তরফে নেওয়া হয়ে থাকে বহু উদ্যোগ। এ সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারি কর্মকাণ্ডের শীর্ষ স্তরীয় সঞ্চালক সংস্থা হল ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ। সরকারের উদ্দেশ্যটা এখানে খুব সুস্পষ্ট। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উন্নয়নে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। পাশাপাশি, মানবসম্পদ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের বিকাশ ঘটিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছানো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ (DST) এই নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে পাখির চোখ করেই নীতি প্রণয়ন এবং কর্মসূচি রূপায়ণের রাস্তায় হাঁটে। এক্ষেত্রে আর একটা বিষয়ও মাথায় রাখা হয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল সমাজের উপকারে লাগানো। এই লক্ষ্যপূরণ খুব দুরুহ নয়। তবে সেজন্য কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে। উন্নয়নের মডেল তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষ (Stakeholder)-কে তাতে সামিল করতে হবে। সরকারের এ সংক্রান্ত সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র বজায় রাখতে হবে। দেশের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (Departments) এবং বাইরের দেশেরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক তথা বহুপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমন্বয়িত উদ্যোগ নিলে তবেই লক্ষ্যপূরণ সহজ হবে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শুরু থেকেই 'মিশন'-এর আকারে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ করে 'Make in-India', 'Start up India', 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান', 'সুস্থ ভারত অভিযান' এবং 'Digital India' কর্মসূচি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাড়তি তৎপরতা যোগ করেছে।

"রাজস্থানের যোধপুর জেলায় গ্রামীণ শিল্পায়ন থেকে শুরু করে বিশাল মাপের আন্তর্জাতিক প্রকল্পে সহযোগী হিসাবে সামিল হওয়া; বিজ্ঞানের সুফলকে সমাজের কল্যাণের দিশায় কাজে লাগানো থেকে শুরু করে উদ্ভাবনার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা; সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ গবেষণা কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা তথা পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে—সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা, জনসংখ্যার পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ক্ষমতায়ন এবং সামগ্রিক বিকাশ। পাশাপাশি, DST সেই রাস্তাটাও তৈরি করে দিতে চায় যাতে করে আমরা উন্নয়নের দিশায় এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে যেতে পারি।"

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণে যেসব বড়ো মাপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে,তথা আগামী দিনের করণীয় বিষয়গুলি নিয়ে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। রাজস্থানের যোধপুর জেলায় গ্রামীণ শিল্পায়ন থেকে শুরু করে বিশাল মাপের আন্তর্জাতিক প্রকল্পে সহযোগী হিসাবে সামিল হওয়া; বিজ্ঞানের সুফলকে সমাজের কল্যাণের দিশায় কাজে লাগানো থেকে শুরু করে উদ্ভাবনার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা; সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ গবেষণা কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা তথা পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে—সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা, জনসংখ্যার পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ক্ষমতায়ন এবং সামগ্রিক বিকাশ। পাশাপাশি, DST সেই রাস্তাটাও তৈরি করে দিতে চায় যাতে করে আমরা উন্নয়নের দিশায় এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে যেতে পারি।

গোটা দেশ জুড়ে জাতীয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা ও বিকাশ (R & D) প্রতিষ্ঠানগুলির সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য 'বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ'-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ সত্তরটিরও বেশি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন 'Computing facility'-সহ এক সুবিশাল 'Super-computing grid' স্থাপন করেছে। 'Computing' এবং 'Big Data Analysis'-এর ক্ষেত্রে ভারতকে

শীর্ষ সারিতে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে চালু করা হয়েছিল 'National Supercomputing Mission'। ২০১৫ সালের মার্চে, মোট সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের এই মিশনের অনুমোদন দেওয়া হয়। উল্লিখিত গ্রিড এই মিশনকে সফল করতে বিশেষ কাজে আসবে।

স্বাস্থ্য পরিচর্যা, তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি, শক্তি/বিদ্যুৎ, সুস্থায়ী বসতি, ন্যানো টেকনোলজি, জলসম্পদ ও নদী ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা/চিকিৎসা/মহাকাশ প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত (কৃত্রিম যৌগ) উপাদান (Advanced materials), নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের মতো ক্ষেত্রগুলি সমাজ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর প্রভূত প্রভাব ফেলে। এসব ক্ষেত্রে নিত্যদিন আমরা যেসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকি তার মোকাবিলা করার জন্য হাতে নেওয়া হয়েছে 'Impacting Research Innovation and Technology (IMPRINT)' প্রকল্প। 'মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক'-এর সঙ্গে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ'-এর গাঁটছড়া বাঁধাটা এই প্রকল্পের জন্য সহজবোধ্য কারণেই অনিবার্য ছিল।

রেল মন্ত্রকের সঙ্গে জ্বালানি বিষয়ক একটি যৌথ গবেষণা ও বিকাশ উদ্যোগে সামিল হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ। জ্বালানির কর্মক্ষমতা বাড়ানো এবং নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তির বিকাশ, বিকল্প জ্বালানির খোঁজ/উদ্ভাবন, ডিজেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে জ্বালানি সংরক্ষণ ইত্যাদির উপরই মূলত জোর দেওয়া হয়েছে এই যৌথ গবেষণা উদ্যোগে।

মেধাবী ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের বিদেশ পাড়ি ঠেকাতে উদ্যোগ। বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন শাখায় গতানুগতিক এবং উদ্ভাবনামূলক গবেষণার পরিসরে মেধাবী গবেষকদের ধরে রাখাটা নিতান্ত জরুরি। এজন্য গবেষণাকে যারা পেশা হিসাবে নিচ্ছেন, সেই সব তরুণ গবেষকদের কর্মজীবনের শুরুতেই গবেষণা চালাতে উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তা দিতে চালু করা হয়েছে 'Early Career Research Award' (ECRA) এই পুরস্কারের মাধ্যমে গবেষকদের তিন বছরের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গবেষণা মঞ্জুরি দেওয়া হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা গবেষণা ও বিকাশ প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নততর সুযোগ-সুবিধার খোঁজে মেধাবী ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের বিদেশ পাড়ি জমানোটা আমাদের দেশে আকছার ঘটে। এই ব্যাপারটা বন্ধ করতে এবং তরুণ বৈজ্ঞানিকদের দেশেই গবেষণা কর্ম চালিয়ে যেতে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করতে চালু করা হয়েছে 'National Post-doctoral Fellowship' (N-PDF)।

বিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন শাখায়, বিশেষত গবেষণার মতো উচ্চশিক্ষার পরিসরে আমাদের দেশে মেয়েদের অংশগ্রহণ বেশ কম। লিঙ্গ বৈষম্যের এই ফারাক বোজাতে ২০১৪ সালে চালু করা হয় 'Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing' বা সংক্ষেপে KIRAN কর্মসূচি। মূলত মহিলা বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ সাম্য সুনিশ্চিত করতেই এই কর্মসূচি চালু করা হয়। যেসব মহিলা বিজ্ঞানী মূলত পারিবারিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পেশাগত জীবনে যতি টানতে বাধ্য হন; এই কর্মসূচি তাদের সামনে নতুন করে সুযোগ এনে দিয়েছে। তাদের ফের গবেষণাকর্ম চালিয়ে যেতে এবং যদি তারা ইচ্ছুক হন,তবে নিজস্ব উদ্যোগ স্থাপনের জন্যও উৎসাহিত করা হচ্ছে।

★ ★ ★ ★ ★

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা কর্মকাণ্ড সমাজ-সংসারের অশেষ উপকারে আসছে। এর আওতায় আসছে বহুবিধ ক্ষেত্র। শক্তির সদ্ব্যবহার, বর্জ্য আবর্জনা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি এবং জৈব সম্পদের সর্বাধিক সদ্ব্যবহার তথা তার দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাপনা এরকমই কয়েকটি ক্ষেত্রের উদাহরণ। তিনটি উদ্যোগ নিয়ে এখানে আলাদা করে আলোচনা করা হল।

● **গরিব মানুষের ঘরে আলো জ্বালাতে 'সূর্য জ্যোতি'** : দিনের আলোকে আবদ্ধ করে অন্ধকারে ঘরে তার ব্যবহারের জন্য একটি কম দামের যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর পরীক্ষামূলক ব্যবহারও সফল। সূর্য জ্যোতি হল মূলত একটি ক্ষুদ্র সৌর গম্বুজ (Micro Solar Dome) বিশেষ। এতে উপরের দিকে একটি স্বচ্ছ অর্ধ-গোলাকার গম্বুজাকৃতি অংশ আছে। 'অ্যাক্রিলিক' জাতীয় পলিমার যৌগ নির্মিত এই অংশটিই সূর্যের আলোকে বন্দি করে। এই আলো এরপর একটি সৌর নল (Sun tube)-এর মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হয়। নলটির অভ্যন্তরের দেওয়ালের গায়ে

উচ্চমাত্রায় প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম প্রলেপের একটি অতি পাতলা স্তর থাকে। দিনের বেলায় সূর্য জ্যোতি ১৫ ওয়াটের LED বাতির সমান আলো দিতে পারে। এই সৌর গম্বুজকে ফোটো ভোল্টেইক (PV) প্যানেলের সাথে যুক্ত করে সূর্যাস্তের পরও চার ঘণ্টা পর্যন্ত আলো পাওয়া সম্ভব। PV প্যানেলের সঙ্গে যুক্ত সূর্য জ্যোতির দাম পড়ছে প্রায় ১২০০ টাকা এবং প্যানেল ছাড়া সূর্য জ্যোতির দাম পড়ছে ৫০০ টাকার মতো। ব্যাপক হারে উৎপাদন শুরু হলেই এই দাম ঝপ করে অনেকটা পড়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

● **গ্রামীণ শিল্পায়নের জন্য দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার** : দেশের সার্বিক বিকাশের জন্য গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে শিল্পকারখানা/শিল্পোদ্যোগ স্থাপন এবং দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি। সেই মতো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মদতে গ্রামাঞ্চলের মানুষজনকে সাহায্য করতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এগিয়ে এসেছে। রাজস্থানের যোধপুর জেলার মালুঙ্গা গ্রামের গ্রামীণ শিল্প তালুক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের এমনই এক উদ্যোগের উদাহরণ। এই শিল্পতালুকে প্রযুক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে তা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে। বর্জ্য আবর্জনাকে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সার্বিক তথা সুস্থায়ী বিকাশ সম্ভব হয়েছে এক্ষেত্রে।

● **পারম্পরিক চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল কেন্দ্র** : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ ২০১৫ সালে পারম্পরিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্র (Ethno Medical Research Centre) স্থাপন করেছে। পাঁচ বছরের জন্য এই কেন্দ্র খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ৮.৯২ কোটি টাকা। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বহু ধরনের জংলি লতা-পাতা-গুল্ম পাওয়া যায় যা অভিনব ঔষধিগুণসম্পন্ন এবং সুগন্ধি উপাদানে ভরপুর। উল্লিখিত কেন্দ্র এই সব জংলি গাছগাছড়ার রাসায়নিক উপাদানের গঠন ও তার পারম্পরিক গুণাগুণ সম্পর্কে গবেষণা চালাবে। এই সব গাছগাছড়া ও তা থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর গুণাগুণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

ভারত-বেলজিয়াম যৌথ উদ্যোগে আর্যভট্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ অবসার্ভেশনাল সায়েন্সেস (ARRIES) টেলিস্কোপ।

সিদ্ধ করার কাজে উদ্যোগী হবে। এই গবেষণা কর্মকাণ্ডের সুফল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে তাদের সামনে জীবিকা অর্জনের আরও ভালো সুযোগ করে দেওয়া হবে। ফলত, তাদের জীবনযাত্রার গুণগত মানের উন্নতি হবে এবং এভাবেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে সাহায্য করা সম্ভব হবে।

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

সুবিশাল আন্তর্জাতিক প্রকল্পে সামিল ভারত। এ পথে হাঁটার পেছনে মূল নীতিগত কারণ একটাই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অত্যাধুনিক শাখাগুলিতে আন্তর্জাতিক স্তরে অর্জিত সুফলের ভাগীদার হওয়া। এবং সেজন্য ভারত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিকে তার উৎকর্ষকে বিনিয়োগ করছে। এতে দু'দিক থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকছে। প্রথমত, আমাদের গবেষক বিজ্ঞানীদের সামনে নিজেদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি এবং শেখার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট গবেষণার সূত্রে শিল্পক্ষেত্রের কার্যকলাপ বৃদ্ধির দৌলতে অর্থনৈতিক দিক থেকেও সুফল মিলছে।

● **তিরিশ মিটার টেলিস্কোপ** : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে মৌনা কিয়াতে 'Thirty Meter Telescope' (TMT) প্রকল্পে ভারতের অংশগ্রহণে ২০১৪-র সেপ্টেম্বরে সায় দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এজন্য সরকারের মোট খরচ হবে ১২৯৯.৮ কোটি টাকা। এই ব্যয়ভার যৌথভাবে বহন করবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ (DST) এবং পরমাণু শক্তি বিভাগ (DAE)। প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দেশের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চিন এবং জাপান। প্রকল্পের নির্মাণ কাজে আর্থিক সহায়তা এবং অন্যান্য বহুভাবে অবদান রাখবে ভারত। এই প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারত বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত—উভয় দিক থেকেই লাভবান হবে।

● **CERN-এর সহযোগী সদস্যপদলাভ** : 'European Organization for Nuclear Research' বা CERN হল নিউক্লীয় এবং কণা পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত (Nuclear and Particle Physics) বিশ্বের বৃহত্তম গবেষণাগার। এখানে গোটা বিশ্ব থেকে আগত বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা ব্রহ্মাণ্ডের মৌলিক গঠন নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। CERN-এ বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটিং-এর যাবতীয় কার্যকলাপে ভারতের বৈজ্ঞানিকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা করছেন। এ কাজে যৌথভাবে তহবিল সংস্থান

করছে পরমাণু শক্তি বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে CERN পরিষদ ভারতকে CERN-এর সহযোগী সদস্য হিসাবে মান্যতা দেয়। সহযোগী সদস্য হওয়ার পর ভারত CERN-এর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ডের ভাগীদার হবে।

● **Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) :** ভারত সরকার দেশের মাটিতে একটি অত্যাধুনিক মহাকর্ষীয়-তরঙ্গ (GW) মানমন্দির গড়ে তোলার বিষয়ে নীতিগতভাবে সায় দিয়েছে। গোটা বিশ্বে এটি এ ধরনের তৃতীয় মানমন্দির হতে চলেছে। এটি হবে জাতীয় স্তরে সমন্বয়িত প্রকল্প। দেশের শীর্ষস্থানীয় তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটির রূপায়ণের কাজে নেতৃত্ব দেবে। পুণের 'Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics' (IUCAA), গান্ধীনগরের 'Institute for Plasma Research' (IPR) এবং ইন্দোরস্থিত 'Raja Ramanna Centre for Adanced Technology' (RRCAT)। California Institute of Technology (Caltech)-এর LIGO Laboratories এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'Massachusetts Institute of Technology' (MIT) এই মানমন্দির গড়ে তুলতে ভারতকে সহযোগিতা করবে।

● **দেবস্থল অপটিক্যাল টেলিস্কোপ :** চলতি বছরের ৩১ মার্চ তারিখে ভারত এবং বেলজিয়াম, দু' দেশের প্রধানমন্ত্রী একসাথে রিমোট টিপে চালু করেন বিশ্বমানের অত্যাধুনিক উৎকর্ষতাবিশিষ্ট ৩.৬ মিটারের এই দূরবীক্ষণ। টেলিস্কোপটি বসানো হয়েছে নৈনিতালের কাছে দেবস্থল-এ। এটি এশিয়ার বৃহত্তম 'Steerable imaging' টেলিস্কোপ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, নৈনিতালস্থিত 'Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES)'-এর বৈজ্ঞানিক এবং বেলজিয়ামের বৈজ্ঞানিকরা যৌথভাবে এটি তৈরি করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনে পর্যবেক্ষণে এই টেলিস্কোপ প্রভূত কাজে আসবে।

সায়েন্স এক্সপ্রেস, ২০১৫

● **ইতালির সঙ্গে সহযোগিতা :** ইতালির ত্রিয়েস্তা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'Sincrotrone Elettra' সে দেশে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দু'টি নতুন পরীক্ষামূলক স্টেশন XRD2 (Two-dimensional X-ray diffraction) এবং XPRESS চালু করেছে। এই দু'টি নতুন 'Energy beamline' গবেষণা চালাবে জটিল আণবিক গঠন বিশিষ্ট নতুন পদার্থ (যেমন—গ্রাফিন) ভেষজ এবং জৈব-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে।

● **জার্মানির সঙ্গে সহযোগিতা :** জার্মানির ডার্মস্টাডট্-এ মৌলিক বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বিশাল 'Accelerator facility' গড়ে তোলা হয়েছে ২০১০-এর অক্টোবরে—'Facility for Antiproton and Ion Research' (FAIR—Gmblt)। এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ ভারত। বিভিন্ন গোত্রের অ্যান্টিপ্রোটন এবং আয়নের অতি নিবিড় রশ্মি ব্যবহার করে এই আন্তর্জাতিক 'Accelerator facility'-র মাধ্যমে আণবিক, নিউক্লীয়, পার্টিকল এবং প্লাজমা পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে গবেষণায় সাহায্য করা হবে। ভারতে এই প্রকল্প যৌথভাবে রূপায়িত করছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এবং আণবিক শক্তি বিভাগ। এছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ দেশে এই অত্যাধুনিক 'FAIR accelerator' সরঞ্জাম তৈরিতে জড়িত আছে। সারা দেশের বহু প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিকদের ৪০-টি দল এই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

★ ★ ★ ★ ★

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতির এই ধারা দীর্ঘমেয়াদে বজায় রাখতে এবং তার সুফল সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এক সমন্বয়িত উদ্যোগ নিয়েছে। এক বাস্তবসম্মত কাঠামো গঠন করে তার অঙ্গ হিসাবে সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিছু লক্ষ্য তাৎক্ষণিকভাবে, কিছু মাঝারি মেয়াদে এবং কিছু লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদে পূরণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এরকম কিছু লক্ষ্যমাত্রা এখানে উল্লেখ করা হল।

● **গবেষণা ও বিকাশ কর্মকাণ্ডের গুণগতমান এবং সংখ্যা বৃদ্ধি :** ভারতকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিরিখে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ৫-টি দেশের মধ্যে অন্যতম হিসাবে তুলে ধরার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গবেষণা ও বিকাশ পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন। দেশে সক্রিয় গবেষক-বিজ্ঞানীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মেধাবী গবেষকদের (উন্নত সুযোগ-সুবিধার খোঁজে) বিদেশে পাড়ি জমানো বন্ধ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য গবেষণার গুণমান, প্রাসঙ্গিকতা এবং তার প্রভাব বিষয়ে নজর দেওয়া হচ্ছে। যাতে করে সমাজ-সংসার এবং শিল্পক্ষেত্রের বিকাশের পাশাপাশি এ দেশের তরুণরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ তথা নিজেদের কেরিয়ার বানাতে আগ্রহী হয়ে

সায়েন্স এক্সপ্রেস-এর ভেতরের দৃশ্য

ওঠে। শক্তি, জলসম্পদ, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জলবায়ু এবং তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে জাতীয় স্তরে বহুবিধ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর সমাধান সূত্র খুঁজতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ শিল্পক্ষেত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গবেষণা ও বিকাশের ক্ষেত্রের অংশীদারিত্বকে আরও নিবিড় করতে চায়। আর একটি নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাধ্যমে সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান ও পরিকাঠামো খাতে আর্থিক বিনিয়োগ। বিশ্ব স্তরীয় প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের বিকাশে সহায়তা করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হবে।

● **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনা এবং নতুন শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি :** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ জাতীয় স্তরে 'National Initiative for Developing and Harneshing Innovations' (NIDHI) নামক একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে একদম সূচনা পর্ব থেকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নতুন স্থাপিত শিল্পোদ্যোগগুলির সম্প্রসারণে সাহায্য করা হবে। উদ্ভাবনা কর্মকাণ্ডের পরিসর আরও বাড়াতে উদ্ভাবনার সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া হবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও। বিশেষ জোর দেওয়া হবে সেই ধরনের উদ্ভাবনার উপর যার সার্বিক প্রাসঙ্গিকতা আছে তথা তৃণমূল স্তরে প্রয়োগে সুফল মিলতে পারে।

"দেশে সক্রিয় গবেষক-বিজ্ঞানীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মেধাবী গবেষকদের (উন্নত সুযোগ-সুবিধার খোঁজে) বিদেশে পাড়ি জমানো বন্ধ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য গবেষণার গুণমান, প্রাসঙ্গিকতা এবং তার প্রভাব বিষয়ে নজর দেওয়া হচ্ছে। যাতে করে সমাজ-সংসার এবং শিল্পক্ষেত্রের বিকাশের পাশাপাশি এ দেশের তরুণরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ তথা নিজেদের কেরিয়ার বানাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।"

প্রযুক্তির বিকাশ এবং প্রসারের জন্য 'Digital Technology'-র ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং শীর্ষস্থান দখলে বিশেষভাবে জোর দেওয়াটা অপরিহার্য শর্ত। 'Supercomputing', 'Cyber Security', 'Big-data Analytics', 'Computational Sciences', 'Modelling and Simulation'-এর মতো Digital Technolgy-র যাবতীয় প্রয়োগেও সিদ্ধ হস্ত হতে হবে। এর সুবাদে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন এমন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সাধারণ নাগরিকদের সামিল করা। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ব্যাপকতা এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির তাগিদ থেকেই তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 'Science Express'-এর মতো ট্রেনের মধ্যে বিজ্ঞানের চলমান প্রদর্শনীর আয়োজন এই লক্ষ্যে এক অভিনব উদ্যোগ। গোটা দেশের, বিশেষ করে বাচ্চাদের উপকারে আসবে এমন উদ্যোগ।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকেন্দ্রিক কর্মসূচিগুলির রূপায়ণ এবং বিকাশে যে সমন্বয়িত উদোগ গ্রহণ করা হচ্ছে তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বুঝতে এই আলোচনা সাহায্য করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে ভারতকে নেতৃত্ব দানের জায়গায় পৌঁছে দিতে এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের উন্নতিসাধনের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে মূল্য সংযুক্ত পরিষেবা জোগানের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ যথেষ্ট সচেতন।❑

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব। এদেশের ১৫-টিরও বেশি বিশিষ্ট বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের পরিচালন বোর্ড/পর্ষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা বিপুল। তার ৩০০-টির উপর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে; ১০-টি পেটেন্ট-এর জন্য আবেদন করেছেন। বহু সম্মান ও পুরস্কারও পেয়েছেন। ইমেল : dstsec@nic.in)

প্রতিরক্ষা গবেষণা : লক্ষ্য জাতীয় বিকাশ

*প্রতিরক্ষা গবেষণা এমন এক ক্ষেত্র যার সুবাদে প্রযুক্তির ভোলবদল ঘটে চলেছে দীর্ঘদিন ধরেই। এই গবেষণার সুফল কেবল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর অর্থে মানুষের কল্যাণ তথা সামগ্রিক ভাবে দেশের উন্নতিতে কাজে আসে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইউরোপ এবং আমেরিকায় এর সার্থক উদাহরণ চাক্ষুস করা গেছে। সেরা মানের সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদে যুদ্ধ চলাকালীন সংশ্লিষ্ট দেশগুলি নিজেদের প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়। যা পরবর্তীকালে সেসব দেশের অসামরিক ক্ষেত্রগুলির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটাতে অণুঘটক হিসাবে কাজ করে। আকাশ (Aerospace)/জেট ইঞ্জিন সংক্রান্ত প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তাক লাগানো উন্নতি হয় বিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে, যুদ্ধের প্রয়োজনে। তা থেকে শুরু করে আজকের দিনের অবারিত ইন্টারনেট ব্যবস্থা—সব ক্ষেত্রেই প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানের সরাসরি ব্যাপক অবদান রয়েছে। লিখেছেন—***ড. জি. সতীশ রেড্ডি***

প্রতিরক্ষা গবেষণা দীর্ঘদিন ধরেই এমন এক ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত, যার হাত ধরে প্রযুক্তির ভোলবদল ঘটে চলেছে। শেষপর্যন্ত এর ফলাফল দাঁড়াচ্ছে; একদিকে জাতির সামরিক ক্ষমতার বিকাশ; পাশাপাশি, তা অসামরিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হওয়ার রাস্তা করে দিচ্ছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইউরোপ এবং আমেরিকায় এর সার্থক উদাহরণ চাক্ষুস করা গেছে। সেরা মানের সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদে যুদ্ধ চলাকালীন সংশ্লিষ্ট দেশগুলি নিজেদের প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়। যা পরবর্তীকালে সেসব দেশের অসামরিক ক্ষেত্রগুলির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটাতে অণুঘটক হিসাবে কাজ করে। আকাশ (Aerospace)/জেট ইঞ্জিন সংক্রান্ত প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তাক লাগানো উন্নতি হয় বিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে, যুদ্ধের প্রয়োজনে। তা থেকে শুরু করে আজকের দিনের অবারিত ইন্টারনেট ব্যবস্থা—সব ক্ষেত্রেই প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানের সরাসরি ব্যাপক অবদান রয়েছে। বিশ্বের যে কোনও স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণায়ক ব্যবস্থা (Global Positioning System—GPS) এবং অন্যান্য হাজারো ধরনের যোগাযোগ প্রযুক্তি (Communication Technology) থেকে শুরু করে ক্যানবন্দী/বিকিরণের সাহায্যে প্রক্রিয়াকৃত খাবার-দাবার হোক বা নজরদারি চালানোর জন্য ড্রোন হোক—প্রতিরক্ষা গবেষণার প্রভূত অবদান আছে এই সব উদ্ভাবনা ও বিকাশের পেছনে। ভারতের প্রেক্ষিতে, অতি প্রয়োজনীয় এই তাগিদটা জোগাতে উদ্যোগী হয়েছে বর্তমান সরকার। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে শীর্ষ স্তরে পৌঁছানো তথা সামগ্রিক বিকাশ—এই দুই লক্ষ্যকে পাখির চোখ করে বাঁধা গতের বাইরে বেরিয়ে গবেষণা কর্মকাণ্ডের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করছে এই সরকার। প্রতিরক্ষা গবেষণাকে 'Make in India' বা 'ভারতে প্রস্তুত' এবং 'দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি' (Skill Development Programme)-এর মতো প্রকল্পের সাথে যুক্ত করায় দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জোয়ার আসতে বাধ্য। প্রতিরক্ষা গবেষণা ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের জন্য এক স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার বাতাবরণও সৃষ্টি হচ্ছে এর ফলে।

প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি

স্টকহল্‌ম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Stockholm International Peace Research Institute—SIPRI)-এর তথ্যভাণ্ডার অনুযায়ী, সারা বিশ্বে প্রতিরক্ষা খাতে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার অর্থ ব্যয় করা হয়। যা কিনা গোটা বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ২.৩ শতাংশ। আমেরিকা একাই ব্যয় করে প্রায় ৬০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় স্থানে আছে চিন। ব্যয় ২১ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। ভারত তার প্রতিরক্ষা খাতে ৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে।

ভারত তার প্রতিরক্ষা বাজেটের মাত্র ৬ শতাংশেরও কম অর্থ ব্যয় করে থাকে দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিকাশ (R&D) কর্মকাণ্ড খাতে। বহু বছর ধরেই এমনটা চলে আসছে। বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিকাশ ব্যয়ের সঙ্গে তুলনায় এই পরিমাণ বেশ কম। তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট ভারতের তুলনায় অনেক অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা এই বাজেটের ১৫ শতাংশ, ব্রিটেন ৮ শতাংশ, চিন ১৫ শতাংশ এবং ইজরায়েল ৯ শতাংশ প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিকাশ খাতে ব্যয় করে থাকে।

দেশের অর্থনীতির উপর প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভিঘাতটি উল্লিখিত তথ্যের মাধ্যমেই স্পষ্টতর হয়। কোনও দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির বেশ তাৎপর্যপূর্ণ একটা অংশ নির্ভর করে, দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং ব্যবস্থাদি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সে দেশের সামর্থ্যের উপর। নচেৎ, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-এর সিংহভাগই বেরিয়ে যায় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি করতে।

বিশ্ব জুড়েই দেখা গেছে, প্রতিরক্ষার জন্যই তা থেকে শেষমেশ সরঞ্জাম তৈরি হয়েছে

এমন অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলির বিকাশেও সবসময়ই সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানই তহবিল জুগিয়ে এসেছে। কালক্রমে তা শিল্প ভিত্তি এবং অর্থনীতিকেই শক্তিশালী করেছে। মূলত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের জন্যই বিকাশ ঘটানো হয়েছিল যেসব প্রযুক্তির—পরে দেখা গেল, অসামরিক ক্ষেত্রগুলিতেও তার ব্যাপক হারে সার্থক প্রয়োগ হচ্ছে এবং এভাবেই এই সব প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

যদি ভারতের কথা ধরা হয়, দীর্ঘ সময় ধরে, অসামরিক প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উদ্ভাবনার ওপরই নির্ভর করে এসেছে প্রতিরক্ষা প্রয়োগসমূহ। কোনও এক অজানা কারণে, সামরিক এবং অসামরিক প্রযুক্তিগুলিকে পৃথক করে ফেলা হয়। বিশ্বে অন্যত্র যেমন এই দুই ধরনের প্রযুক্তি একে অন্যের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে, তার বদলে এখানে উভয়ের মধ্যে এক বিভাজনের পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়। ভারতে প্রথম থেকেই, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাতা ও নক্শা প্রণেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আসা হচ্ছে। কোনও মৌলিক চিন্তা-ভাবনার এবং সরঞ্জামের বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়নি এবং এভাবেই ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক মৃত অশ্বে পরিণত হয়। যথাযথ গবেষণা কর্মকাণ্ড এবং পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাবে আমরা বহুলাংশে আমদানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি।

যাই হোক, সাম্প্রতিক সময়ে, ভারত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের রাস্তায় অনেকখানি এগিয়েছে। এখন আমরা যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, সেখানে দেশে শিল্পোদ্যোগ এবং নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোনও ঘাটতি নেই। শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রের বাড়বৃদ্ধি ঘটেছে বেশ চোখে পড়ার মতো। বহু দেশীয় শিল্পকারখানা তাদের বিদেশি কাউন্টারপার্ট-এর সাথে পুরোদমে প্রতিযোগিতা চালিয়ে টিকে রয়েছে। সেই দিন আর দূরে নেই, যখন ভারত, যে এতদিন আমদানিকারক দেশ হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে এসেছে, অচিরেই নিজেকে নেট রপ্তানিকারক দেশের শিরোপায় ভূষিত করতে পারবে।

দেশীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিকাশের সৌজন্যে আকাশ বা 'Aerospace' শিল্পভিত্তির এক ভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। যা দেশের আগামী দিনের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ডের সহায়ক হবে। উদাহরণ হিসাবে, 'আকাশ' সমরাস্ত্র ব্যবস্থার (প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে) অন্তর্ভুক্তি এবং উৎপাদন ব্যয় প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। অথচ, এই সমরাস্ত্র ব্যবস্থা একাই দু' হাজারেরও বেশি ক্ষুদ্র, স্বল্পায়তন ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের (MSME) জন্য এবং কয়েকটি DPSU (Defense Public Sector Undertaking)-সহ আধ ডজন বৃহদায়তন শিল্পের জন্য ব্যবসার সুযোগ করে দিয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি সমরাস্ত্র ব্যবস্থা উৎপাদনের পঙ্‌ক্তিতে অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিকাশ

১৯৫৮ সাল থেকে অগ্রগতির সৌজন্যে প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং বিকাশ ক্ষেত্র স্ট্যাটেজিক মিসাইল ব্যবস্থা; ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার; লাইট কমব্যাট এয়ারক্র্যাফ্‌ট-এর মতো ইলেকট্রনিক্স, নেভাল অ্যান্ড কমপ্লেক্স প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দিতে সক্ষম।

ভারত আজ, বিশ্বের সেই হাতে গোনা পাঁচটি মাত্র দেশের সঙ্গে এক সারিতে জায়গা করে নিয়েছে, যাদের হাতে আছে আন্তঃমহাদেশীয় ভূমি-থেকে-আকাশে/আকাশ-থেকে-আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র (Intercontinental Ballistic Missile—ICBM)। বিশ্বের সেই চারটি মাত্র দেশের অন্যতম, যাদের বহু স্তরীয় সামরিক পরিকল্পনা প্রতিরোধী সামর্থ্য (Multi-Level Strategic Deferrence Capability) আছে। বিশ্বের সেই পাঁচটি মাত্র দেশের অন্যতম। যাদের নিজস্ব ভূমি থেকে আকাশে/আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা কর্মসূচি (Ballistic Missile Defense Programme) এবং জলের নিচে থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার ক্ষমতা আছে। বিশ্বের সেই সাতটি মাত্র দেশের অন্যতম যারা নিজেরাই নিজস্ব প্রধান সাঁজোয়া বাহন (Main Battle Tank) এবং দেশীয় প্রযুক্তিভিত্তিক চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান (4th Generation Combat Aircraft) তৈরি করেছে। বিশ্বের সেই ছয়টি মাত্র দেশের অন্যতম যারা নিজেরাই পরমাণু সমরাস্ত্র সজ্জিত ডুবোজাহাজ (Nuclear Powered Submarine) তৈরি করেছে। এছাড়াও বিশ্বের মাত্র কয়েকটি দেশেরই সমরাভিযান চালানোর মতো নিজস্ব বৈদ্যুতিন পরিকাঠামো/সরঞ্জাম (Electronic Warfare) এবং একাধিক পাল্লায় কাজ চালাতে সক্ষম রাডার কর্মসূচি (Multi Range Radar Programme) আছে। ভারত তার অন্যতম।

প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিকাশের দৌলতে বহু সাজসরঞ্জাম তৈরি হয়েছে; বিবিধ ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটেছে। বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে) অতি উচ্চতাবিশিষ্ট এলাকায় চাষাবাদ, ডেঙ্গু ও চিকুনগুণিয়ার মতো রোগ সংক্রমণ তথা বিবিধ কীট প্রতিরোধক প্রযুক্তি, খাদ্যে বিষক্রিয়া নির্ণয় করার কিট—এগুলি সবই ক্রমে অসামরিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক হারে প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিকাশ সংস্থা (Defense Research and Development Organisation—DRDO) নিউক্লীয় প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি এবং রাসায়নিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এমন বেশ কিছু সরঞ্জাম/পন্থা উদ্ভাবন করেছে যা অশেষ কাজে আসছে। সম্ভাব্য যুদ্ধস্থল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধান কাজের উপযোগী বাহন, 'Reconnaissance Vehicles' এবং আয়নিত বিকিরণের পরিমাণ পরিমাপ করার যন্ত্র, 'DOsi meter' এরকম কিছু উদ্ভাবন। যা অসামরিক প্রয়োজনেও প্রয়োগ করা হচ্ছে ইতোমধ্যেই। হিমবাহ অঞ্চলে মানুষের শরীরের প্রাকৃতিক বর্জ্যের ব্যাকটিরিয়ার মতো অণুজীব ব্যবহার করে জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো হয়েছিল আদ্যান্ত সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনেই। অসামরিক ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি কী পরিমাণ সুফল দিতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়; বিশেষ করে যখন স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মতো ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প নিয়ে সরকার উঠে-পড়ে লেগেছে।

আগামী দিনে বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জায়গায় পৌঁছানোর লক্ষ্যকে পাখির চোখ করে আমাদের এমন প্রযুক্তির বিকাশে উদ্যোগী হতে হবে যাকে আমরা আগামী দিনের প্রযুক্তির (Futuristic Technology) তকমা দিতে পারি। অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তির চর্বিতচর্বনের পথ ত্যাগ করে, নিজেদের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এগোতে হবে। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলিতে সামনের সারিতে উঠে আসতে হবে। বিভিন্ন গবেষণা ও বিকাশ প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ উন্নত মানের (State of the Art) পরিকাঠামো-সহ গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলাটা হবে এই দিশায় প্রথম ধাপ। যেসব গবেষণা কেন্দ্র নির্দিষ্ট প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করবে। ক্ষুদ্রায়তন এবং মাঝারি শিল্পে উদ্ভাবনা কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা তথা তার পৃষ্ঠপোষকতা করা জরুরি। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত এমন শিল্পোৎপাদন (Manufacturing) প্রতিষ্ঠান এখন দেশের জন্য জরুরি, যারা নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনার দিকে বিশেষভাবে নজর দেবে। পাশাপাশি, এসব প্রযুক্তির সার্বিক রপ্তানির দিকে উদ্যোগী হয়ে দেশের মূল্যবান বিদেশি মুদ্রা আয়ের পথ প্রশস্ত করতে হবে। এরকম বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রযুক্তিগত বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে।

● **Bio-sensors :** বিশেষ ধরনের কোষ, কলা, নিউক্লিক অ্যাসিড, অ্যান্টিবডি, উৎসেচক, অণুজীব ইত্যাদির মতো জৈব বস্তুকে ব্যবহার করে বিভিন্ন পদার্থের উপস্থিতি (পরিবেশে/মানবদেহে/সামগ্রীতে) নির্ণয় করতে ব্যবহার হয় এই প্রযুক্তি। যেমন—মধুমেহ রোগীর রক্তে শর্করার পরিমাপ, বাতাসে ভারী ধাতুর মতো দূষক পদার্থ, জৈব সন্ত্রাস কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে পরিবেশে ক্ষতিকর ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়ার 'রিমোট সেন্সিং', উপকূল অঞ্চলের সাগর জলের গুণমানের 'রিমোট সেন্সিং', রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর খোঁজ, খাদ্যে বিশেষ করে মাংস এবং মধুতে অ্যান্টিবায়োটিক বা বৃদ্ধি সহায়ক প্রোটিন-এর মতো ওষুধের অবশিষ্টাংশের হদিস ইত্যাদি।

● **Photomics :** আলোর কণা বা 'Photon' সংক্রান্ত অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তি দৈনন্দিন জীবনের বহু ক্ষেত্রের পাশাপাশি বিজ্ঞানের আধুনিকতম সব শাখাগুলিতেই—লাইট ডিটেকশন, টেলি-যোগাযোগ, তথ্যের প্রসেসিং, ফোটোনিং কম্পিউটিং, লাইটিং, স্পেকট্রোসকপি, হলোগ্রাফি, মেডিসিন, রোবেটিক্স ইত্যাদিতে অসংখ্যভাবে প্রয়োগ করা হয়।

● **NEMS :** Nanoelectromechanical System.

● **MEMS :** Microelectro-mechanical System.

● **High Energy Meterials (HEMs) :** রকেট/ক্ষেপণাস্ত্রের তরল ও কঠিন জ্বালানি (Propellants), শক্তিশালী বিস্ফোরক ইত্যাদি।

● **Futuristic Power Supplies :** আগামী দিনে শক্তির অস্বাভাবিক বর্ধিত চাহিদা মেটানোর উপযোগী শক্তি উৎস ও শক্তি উৎপাদন তথা সরবরাহ সংক্রান্ত প্রযুক্তি।

● **Stealth Technology :** একে 'LO tech' (Low observable technology)-ও বলা হয়। মূলত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি। শত্রুপক্ষের নজর এড়িয়ে হানাদারি চালাতে/নজরদারি চালাতে সক্ষম বিমান, পোত, ডুবোজাহাজ, মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র, স্যাটেলাইট বা উপগ্রহের নক্শা নির্মাণে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

● **Advanced materials :** অত্যাধুনিক সরঞ্জাম (প্রতিরক্ষা/চিকিৎসা/মহাকাশ প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে) প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত উপাদান (কৃত্রিম যৌগ) সংক্রান্ত প্রযুক্তি।

● **High Performance Computing (HPC) :** সাধারণভাবে একে, IBM, Cray ইত্যাদি দশাসই বহুজাতিক সংস্থাগুলির সুপার কম্পিউটার, মনস্টার মেশিন ইত্যাদি প্রযুক্তির সমার্থক বলা যেতে পারে, যা বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মনুষ্যজাতির সামনে সবচেয়ে বড়ো ইস্যুগুলি—মহাবিশ্বের উৎপত্তি, নতুন ক্যান্সারের ওষুধ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করছে।

ভাবীকালের গবেষণা ও বিকাশ তখনই সম্ভব যখন বৈজ্ঞানিক শ্রমশক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাবে। তবে, কেবলমাত্র গবেষণা লোকবলের বাড়বৃদ্ধি কখনই কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে পারবে না, যতক্ষণ না গবেষমা সহায়ক একটা পরিবেশ তৈরি করে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির সুফল

প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মকাণ্ড একটি জাতির সামর্থ্যকে ধরে রাখে। তাকে সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অগ্রগতি ঘটাতে সাহায্য করে। এছাড়াও, মূল ধারার গবেষণার সূত্রে, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানে অনেক সময় এমন কিছু দিকে উদ্ভাবনার রাস্তা খুলে যায়, যা মানুষের জীবনকেই সদর্থে পালটে দেয়। 'Advanced Composites' বিষয়ে গবেষণা সূত্রে উদ্ভাবিত 'Floor Reaction Orthosis (FRO)' calliper (যা সেরিব্রাল পাল্‌সি আক্রান্তদের বিশেষ কাজে আসে) এবং হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত 'Raju-Kalan Stent' এর সার্থক উদাহরণ। Bio-medical (চিকিৎসায় ব্যবহৃত জৈব) সরঞ্জাম, implants (দাঁতের চিকিৎসায় ব্যবহৃত), 'Infection imaging'-এর জন্য diagnostic সরঞ্জাম, Industrial Tomography System, (তেজস্ক্রিয়) বিকিরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার সরঞ্জাম, ফল এবং শাকসবজিতে কীটনাশকের উপস্থিতি ও দ্রুত তার পরিমাণ নির্ণয়, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি—এসবই আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা গবেষণা সূত্রেই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি।

সামরিক এবং অসামরিক গবেষণা ও বিকাশ কর্মসূচির মধ্যের প্রাচীরটা যদিও ভেঙে ফেলা যায়নি, তাসত্ত্বেও উভয় ক্ষেত্র থেকেই বহু ধরনের সুফল মিলেছে, যা আদতে জাতীয় বিকাশের পথকেই সুগম করছে। সামগ্রিক বিকাশের জন্য প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পুঁজির সংস্থানে বিভিন্ন আর্থিক উপকরণকে কাজে লাগাতে উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন করতে হবে। যাতে করে প্রতিরক্ষা উদ্ভাবনা ক্ষেত্রে জ্ঞান, সামর্থ্য এবং কর্মদক্ষতাকেও পুঁজি হিসাবে ধরা হয়। প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বৃহত্তর অর্থনৈতিক সুফল এনে দেবে, কারণ সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগগুলি তাল-মেল রেখে কাজ করবে উন্নয়নের সাধারণ লক্ষ্যমাত্রাকে ছুঁতে।

প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য দক্ষতা বিকাশ উদ্যোগ

যে কোনও প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদি সামর্থ্য নিহিত থাকে তার সঙ্গে যুক্ত মানবসম্পদের মধ্যে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের মতো অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট জ্ঞানভিত্তিক কর্মপরিসরের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি করে খাটে। প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পনা নিতে হবে। পাঠ্যক্রমকে অবশ্যই এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে করে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু তাতে যুক্ত করা হয়। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিকে মজবুত করতে দেশের অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠ্যসূচিতে উল্লিখিত পাঠ্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফলত, গবেষকরা একেবারে প্রবেশিকা স্তরেই প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবেন।

সাধারণভাবে বিজ্ঞান, তথা বিশেষ করে প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, বিশ্ব স্তরে সহযোগিতার ভিত্তিতে এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে এগোয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, জাতি বা রাষ্ট্র, এজেন্সি, বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্থা আপাতদৃষ্টিতে আলাদা হলেও, আদতে ধীরে ধীরে তারা বহু শাখাবিশিষ্ট বিভিন্ন দল গড়ে তুলছে, যারা জোট বেঁধে সাধারণ (Common) সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করছে। যখন সম্পদ (Resource) এবং চিন্তাধারা (Idea) পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদান করা হয়, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের (Stake holders) মধ্যে ঝুঁকিও ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। ফলত, প্রতিবন্ধকতাগুলির অবসান হয়ে উন্নয়নে গতি আসে। এটাই এখন সময়ের দাবি।

সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

এখনও পর্যন্ত আমরা এমন অনেক প্রযুক্তির দিকে মনোনিবেশ করে আসছি, যা থেকে কোনও সুফল আদৌ পাইনি। কাজেই এখন আমাদের আগামী দশ-বিশ বছরের জন্য আগামী দিনের উপযোগী প্রযুক্তিগুলি (Futuristic Technology)-কে চিহ্নিত করে, সেই সব প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও বিকাশ কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে হবে। IIT মাদ্রাজ, ITT মুম্বাই, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা গবেষণা ও বিকাশ কেন্দ্রে নির্দিষ্ট প্রযুক্তি বিষয়ে ফোকাস করে গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এই সব কেন্দ্রে সর্বাধুনিক মানের (State of the Art) পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং তহবিল জোগানো আবশ্যক। ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্পে উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। দেশে সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উদ্ভাবনামূলক শিল্পোৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এসব প্রযুক্তিকে সার্বিক রপ্তানির মাধ্যমে দেশের জন্য মূল্যবান বিদেশি মুদ্রা আয়ের কাজে লাগাতে হবে।

ভারত ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপত্র/সরঞ্জামের বৃহত্তম আমদানিকারক থেকে মূখ্যত রপ্তানিকারক হিসাবে বদলে ফেলতে চলেছে। যাই হোক, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

(ক) প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র প্রযুক্তিনিবিড়। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার/প্রয়োগ হয় ব্যাপক হারে। ব্যবহৃত প্রযুক্তির পরিবর্তনও হয় দ্রুত। বাস্তব আশঙ্কা এবং পরিস্থিতি অনুমান করে পালটে ফেলা হয় লক্ষ্য; ফলত, পুরোনো প্রযুক্তির জায়গা নেয় নিত্যনতুন প্রযুক্তি।

(খ) প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানে গবেষণা ও বিকাশ কর্মসূচির সিংহভাগ চালায় সরকারি এজেন্সি/সংস্থাগুলি। বেসরকারি ক্ষেত্রে অংশভাক সামান্যই।

গবেষণা ও বিকাশ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও বেশি করে নজর দিতে হবে মৌলিক (Basic) গবেষণা এবং 'Translational' গবেষণার উপর। 'Translational Research' বলতে বোঝায় সেই ধরনের গবেষণা যা 'Basic Research'-এর মাধ্যমে উঠে আসা গবেষণা ফলাফলকে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের উন্নতি ও ভালো থাকার কাজে প্রয়োগ করে।

সরকারি ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলিকে উল্লেখিত গবেষণা ফলাফলের আরও বিকাশ ঘটাতে ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তির উৎপাদনের জন্য সমন্বয়িত করতে হবে; যাতে করে তারা অগ্রণী সমন্বয়ক হিসাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা ও বিকাশ কর্মসূচিতে বেসরকারি ক্ষেত্রকেও পুঁজি বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরও গড়ে তুলতে হবে গবেষণা ও বিকাশ ব্যবস্থা এবং উপ-ব্যবস্থা। ফলত, এ ধরনের শিল্পোদ্যোগুলি তাদের দক্ষতা/সামর্থ্যকে অগ্রণী সমন্বয়কের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সমর্থ্য হবে।

আজকের দিনে, বেসরকারি ক্ষেত্র ইতোমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। গত দশ বছরে, বেসরকারি শিল্প সংস্থাগুলি শুধুমাত্র সামান্য উৎপাদকের ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসে অত্যাধুনিক গুণমানবিশিষ্ট (State-of-the-art) (গবেষণা ও বিকাশ) ব্যবস্থা তথা উপ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জিং ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'আকাশ' মিসাইল/ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার ৭০ শতাংশ সরঞ্জামই এসেছে একগুচ্ছ বেসরকারি শিল্পকারখানা থেকে। প্রমাণিত হয়েছে যে, বেসরকারি শিল্পকারখানাগুলি বড়োসড়ো মাপের চ্যালেঞ্জকে সার্থকভাবে পূরণ করার মতো জায়গায় পৌঁছেছে।

ভারত সরকারের নতুন নীতির দৌলতে বহু বিদেশি উদ্যোগ ভারতে বিপুল বিনিয়োগ-সহ কাজকারবার শুরু করেছে তথা শিল্পোদ্যোগ ইউনিট স্থাপন করেছে। বিকাশ এবং সম্ভাব্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিশায় এটা একটা বড়োসড়ো পদক্ষেপ। 'Make in India' বা 'ভারতে প্রস্তুত' কর্মসূচির ক্ষেত্রে যে সাড়া মিলেছে, তা এক কথায় অভিভূত করে দেওয়ার মতো। যে শিল্পোৎপাদন (Manufacturing) ক্ষেত্র বহুদিন ধরে অবহেলিত হয়ে পড়েছিল; আজ উৎসাহ ফিরে পাচ্ছে; শক্তিশালী হচ্ছে। ভারতের প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের জন্য তা এক শুভ ইঙ্গিত।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা। ইমেল : dstsec@nic.in)

জাতির সেবায় পরমাণু শক্তির সদ্ব্যবহার

*দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, ১৯৪৫ সালে জাপানের উপর দু'টি পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করা হয়। যার ভয়াবহতা গোটা মানবজাতির স্নায়ুকে বিকল করে দেয়। কারণ, এর আগে অন্য কোনও হাতিয়ার গণহত্যার এই কদর্য রূপ দেখায়নি। এরপর থেকেই শান্তির জন্য পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগানোর দাবিতে সোচ্চার হয় গোটা বিশ্ব। প্রথম উদ্যোগী হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার। ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ৪৭০তম পূর্ণ অধিবেশনে। পাশে পেয়েছিলেন ভারতেরই শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে—সাধারণ সভার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট। এই সূত্রেই, পরের ধাপে ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী, জেনেভাতে 'আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা' গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়। ভারতীয় পরমাণু শক্তি কর্মসূচির সূচনা হয় ১৯৫৪ সালে, পরমাণু শক্তি আয়োগ গঠনের মাধ্যমে। তারপর থেকে পরমাণু শক্তিকে নানা কাজে ব্যবহারের দিশায় অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা। পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ে তর্কবিতর্ক এত বেশি বলে এটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে শান্তিপূর্ণ কাজে এই শক্তিকে ব্যবহারের একমাত্র উপায় এটাই। স্বাস্থ্য এবং কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে ব্যাপক হারে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ হচ্ছে। এছাড়াও বর্জ্য নিকাশী আবর্জনা পরিশোধন, ভূ-গর্ভস্থ জল সম্পদ-এর উৎস খুঁজে বের করা, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-তল জল কলুষমুক্ত করা, চিকিৎসা সামগ্রীর নির্বীজন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তোলার নতুন পাইপ লাইনের জোড় পরীক্ষা করা—এরকম অসংখ্য কাজে লাগানো হচ্ছে পরমাণু শক্তিকে। সংশ্লিষ্ট নিবন্ধে পরমাণু শক্তি প্রযুক্তির প্রয়োগের এই ব্যাপক পরিসর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—***কে. এন. ব্যাস ও এম. রমণমূর্তি***

"উন্নয়নশীল দেশগুলির পূর্ণ শিল্পায়নের জন্য তথা আমাদের এই (মানব) সভ্যতার ধারা অব্যাহত রাখা ও তার আরও বিকাশের জন্য পারমাণবিক শক্তি কেবল এক হাতিয়ার মাত্র নয়; তা চূড়ান্ত আবশ্যকও বটে। কীভাবে পারমাণবিক শক্তি নিঃসরণ এবং তার ব্যবহার করা যায়—মানুষের সেই জ্ঞান অর্জন পর্বকে অবশ্যই মানবসভ্যতার ইতিহাসে তৃতীয় যুগ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।"

—হোমি জাহাঙ্গির ভাবা

কোনও জাতির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য মৌলিক শর্ত হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্য। বিশ শতকের প্রথম দিককে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। প্রকৃতি (Nature) সম্পর্কে জ্ঞানের পরিসর আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে মানুষ সতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। এই লক্ষ্যপূরণে জোরদার কর্মতৎপরতার সূত্রেই এই যুগের সূচনা। প্রকৃতির শক্তিকে আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে অনুসন্ধান, তাকে অনুধাবন এবং সম্ভবত সেই শক্তিকে জয় করারও এক সহজাত প্রবণতা রয়েছে মানুষের মধ্যে। এই প্রবণতাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নানা শাখা-প্রশাখার দরজা হাট করে খুলে দিয়েছে। পদার্থের ধর্ম (Nature of matter) বিশদ অনুধাবনের জন্য কৌতূহল সূত্রেই পরমাণুর গঠন আবিষ্কার। কেন্দ্রে একটি নিউক্লিয়াস, যাকে ঘিরে ইলেকট্রনগুলি নির্দিষ্ট বদ্ধ কক্ষপথে ঘুরে চলেছে। অতি সংক্ষেপে এই হল পরমাণুর গঠন। আবিষ্কার করেন রাদারফোর্ড এবং বোর নামে দুই বিজ্ঞানী। এর পর পরমাণুর স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা (Natural radioactivity) বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বেকারেল এবং পরমাণুর স্বতঃস্ফূর্ত বিঘটন (Spontaneous disintegration) বিষয়ে আলোকপাত করেন রাদারফোর্ড। তবে ১৯৩২ সালে চ্যাডউইক-এর 'নিউট্রন' কণা আবিষ্কারের সূত্রে, পরমাণু বিজ্ঞান (Nuclear Science) নামে পরিচিত বিজ্ঞানের বিশেষ শাখাটি নিশ্চিতভাবে এক ধাক্কায় অনেকখানি এগিয়ে যায়।

আইনস্টাইন শক্তি (Energy) এবং ভর (Mass)-এর মধ্যে তুল্যতাসূচক সমীকরণের কথা বলেন এবং আন্দাজ করেন পদার্থের মধ্যে বিপুল পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত আছে, যাকে বিশেষ পরিস্থিতিতে কাজে লাগানো সম্ভব। সুস্থিত পরমাণু কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াইকে আলফা কণার দ্বারা তীব্র গতিতে আঘাত করে কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি যে সম্ভব, তা ততদিনে জানিয়ে দিয়েছেন পিয়ের কুরি ও মাদাম কুরি। সেটা হল ১৯৩৪ সাল। নিউক্লীয় বিভাজন (Nuclear fission) প্রক্রিয়া আবিষ্কার এবং সেই সূত্রে বিপুল পরিমাণ শক্তির বিমুক্ত হওয়ার কথা ১৯৩৮ সালে জানান বিজ্ঞানী অটো হান এবং ফ্রিৎজ স্ট্রাসম্যান। ১৯৩৮ সালেই লিও জিলার্ড ধারাবাহিক স্বয়ংক্রিয় বিভাজন প্রক্রিয়া (Self-sustaining fission) চালানোর জন্য নিউক্লীয় শৃঙ্খল বিক্রিয়ার (Nuclear chain reaction) বিষয়টি আন্দাজ করেন। পরের ধাপে, এনরিকো ফার্মি ধারাবাহিক স্বয়ংক্রিয় নিউক্লীয় শৃঙ্খল বিক্রিয়ার সফল প্রতিপাদন

ড. হোমি ভাবা ১৯৫৫ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত 'পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার' বিষয়ে প্রথম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন

করেন এবং চূড়ান্ত ধাপে, ১৯৪৫ সালে পরমাণু অস্ত্র তৈরি ও তার ব্যবহার বিশ্বকে চিরকালের জন্য বদলে দেয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। যার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এইসব নারকীয় অস্ত্রসম্ভারের দৌলতে মানবসভ্যতা নিজেকে বেশ কয়েকবার সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে দেওয়ার মতো ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে। এই যুগকেই আবার চিহ্নিত করা হয় প্রকৃতির শক্তির স্বরূপ মানবজাতির সামনে উন্মোচনকারী আবিষ্কারের মাধ্যমে। যেসব আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছিল নোবেল পুরস্কার জয়ী একদল নিবেদিত প্রাণ বৈজ্ঞানিকের অভূতপূর্ব গবেষণা কর্মকাণ্ডের দৌলতে। এরা সকলেই আর কোনও উদ্দেশ্যে নয়, কেবলমাত্র প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের তাগিদে সামিল হয়েছিলেন একাজে।

শান্তির জন্য পরমাণু

সব পরিস্থিতিতেই এক নতুন আশা, এক নতুন সম্ভাবনা জাগে। বিশ শতকে দু'-দু'টি বিশ্বযুদ্ধ গোটা দুনিয়াকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ হতাহত হন। মানুষ প্রত্যক্ষ করে মানুষের প্রতি মানুষের বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতার চরম অমানবিক নিদর্শন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, ১৯৪৫ সালে জাপানের উপর দু'টি পরমাণু বোমা ফেলা হয়। তার ভয়াবহতা গোটা মানবজাতির স্নায়ুকে বিকল করে দেয়। খুলে দেয় জ্ঞানচক্ষু। কারণ, এর আগে অন্য কোনও হাতিয়ার গণহত্যার এই কদর্য রূপ দেখায়নি।

তবে এই সমস্যাদীর্ণ সময় পর্বেই এক নতুন যুগারম্ভের আশা জেগে ওঠে। পরমাণু শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের জন্য পথ খোঁজা শুরু হয়। 'শান্তির জন্য পরমাণু' (Atoms for Peace) বিষয়ে প্রথম সচেষ্ট হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার (Dwight D. Eisenhower)। ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ৪৭০তম পূর্ণ অধিবেশনে। একাজে মার্কিন রাষ্ট্রপতি যাকে পাশে পেয়েছিলেন, তিনি অন্য আর কেউ নন; আমাদের ভারতেরই শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—সাধারণ সভার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট। অধিবেশনে আইজেনহাওয়ার-এর ভাষণ ছিল পরমাণু শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক মহলের মনোযোগ আকর্ষণের দিশায় এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তেজস্ক্রিয়তাকে বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের বিষয়ে, বিশেষ করে পরমাণু শক্তিকে নিয়মিতভাবে শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো সম্পর্কে দায়বদ্ধতার কথা বলেন আইজেনহাওয়ার। তার কথায়, "সেই পথ খুঁজে দেখতে হবে, যাতে করে মানুষের অলৌকিক উদ্ভাবন ক্ষমতা তার নিজেরই মৃত্যুর নিশ্চিত কারণ হয়ে না ওঠে; বরং তার জীবনের জন্য উৎসর্গীত হয়।" এর পর, ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী, জেনেভাতে "আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা" (International Atomic Energy Agency—IAEA) গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়। জেনেভার এই সম্মেলনে চেয়ারম্যান ছিলেন ভারতের পরমাণু শক্তি কর্মসূচির 'জনক' হিসাবে পরিচিত, ড. হোমি জাহাঙ্গির ভাবা। IAEA-

-এর উদ্দেশ্য খুবই সুস্পষ্ট; প্রথমত, সমগ্র মানবজাতির উপকারের জন্য পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের দিশা খোঁজায় উদ্যোগ নেওয়া; এবং দ্বিতীয়ত, পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধ।

ভারতীয় পরমাণু শক্তি কর্মসূচির সূচনা হয় ১৯৫৪ সালে, পরমাণু শক্তি আয়োগ (Atomic Energy Commission) গঠনের মাধ্যমে। এই আয়োগ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নেন দেশের প্রবাদপ্রতীম বিজ্ঞানী, প্রশাসক এবং অসাধারণ দূরদ্রষ্টা ড. হোমি জাহাঙ্গির ভাবা। তারপর থেকে পরমাণু শক্তিকে নানা কাজে ব্যবহারের দিশায় অনেকটা পথ এগোনো গেছে, বেশ সাফল্যও অর্জন করা গেছে। এখানে আমরা এই সব ব্যবহারিক প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রের সম্পর্কে আলোচনা করব। আমাদের পরমাণু শক্তি কর্মসূচির সুবিশাল পরিসরের মধ্যে খাদ্য সুরক্ষা, শক্তি সুরক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়োজিত তথা চিকিৎসাবিজ্ঞান, সামাজিক ক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োগের মতো কতিপয় বিষয়কে সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে। কোনও অর্থেই তা, এই ক্ষেত্রে যা কিছু সম্ভাবনা আছে তথা অর্জিত সাফল্যের পূর্ণ খতিয়ান নয়। তা সত্ত্বেও, আমাদের দেশের পরমাণু শক্তি কর্মসূচির যে 'মোটো' বা মূলনীতি; অর্থাৎ, দেশের নাগরিকদের উন্নত মানের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা জোগানোর লক্ষ্য নিয়ে পরমাণু এবং (তেজস্ক্রিয়) বিকিরণ প্রযুক্তির ব্যবহার—সেই বিষয়টি বুঝতে নিঃসন্দেহে এই আলোচনা খানিকটা সহায়ক হবে।

বিকিরণ—এক দু'-ধার তরোয়াল

তেজস্ক্রিয়তা, অর্থাৎ, পরমাণু থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের বিষয়টি নিউক্লীয় বিয়োজন-এর যুগে পৌঁছানোর বহু আগেই আবিষ্কৃত হয় এবং ক্যান্সার বা কর্কট রোগের চিকিৎসার জন্য এই বিকিরণের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারও বিশ্বের বেশ কিছু অংশে ততোদিনে চালু হয়ে গিয়েছিল। বরং এটা বলাটা সম্ভবত আরও সমীচীন হবে যে, বিশ শতকের প্রথম দিকেই ক্যান্সার নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা তথা উপশমকারী হিসাবেই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে বিশ্ব প্রথম জানতে পারে। পরের দশকগুলিতে ক্রমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিউক্লীয় শক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভবপর হয় নিউক্লীয় বিভাজনের দৌলতে। যাই হোক, বর্তমানে কৃষিকাজ, ওষুধ এবং শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণুকে ব্যবহারের পরিসর অনেকখানি বিস্তৃত হয়েছে। এই সব প্রয়োগের জন্য দরকার কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (Artificial radioisotope) তৈরি। এ ধরনের আইসোটোপ থেকে যে তেজস্ক্রিয়তা নিঃসরণ হয় তারই ব্যবহার হয় এক্ষেত্রে। 'রিঅ্যাক্টর' বা 'পার্টিকল অ্যাক্সিলেটর'-এ প্রাকৃতিক স্থায়ী (মৌলের) আইসোটোপ-এর নিউক্লীয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরকম প্রায় ২০০-রও বেশি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নিয়মিত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগের উল্লেখ এখানে করা হল।

● **স্বাস্থ্য-পরিচর্যা থেকে আরোগ্য :**

স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ ক্রমশ বেড়েই চলেছে এবং তা পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের দিশায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য-পরিসংখ্যান বলছে, বর্তমান প্রেক্ষিতে ভারতে বছরে প্রায় ৬ লক্ষেরও বেশি রোগীর ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের কাজে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার করা হয়। গোটা দেশে এরকম ৫০০-রও বেশি কেন্দ্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, যেগুলি এই বিশেষ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত; তেজস্ক্রিয়-ভেষজ (Radiopharmaceuticals) প্রয়োগ করে থাকে রোগ নিরাময়ে। তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা বিকিরণ প্রয়োগ করে রোগের চিকিৎসা/উপশম করে থাকে এমন ২৭০-টিরও বেশি 'রেডিওনিউক্লাইডস থেরাপি ইউনিট' চালু আছে গোটা দেশের ৬২-টি শহরে। পরমাণু শক্তি বিভাগ (Department of Atomic Energy—DAE)-এর আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে এই বিশেষ প্রয়োগ কৌশলের পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র (BARC); উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের উপকার তথা এই প্রয়োগ কৌশলের সুফল প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

● **নিউক্লীয় মেডিসিন—রোগ নির্ণয় :**

নিউক্লীয় মেডিসিন (Nuclear medicine) হল চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক বিশেষ শাখা। বহু ধরনের রোগব্যাধি ও শারীরিক পরিস্থিতির নিরাপদ ও বেদনাহীন উপায়ে চিকিৎসা তথা রোগ নির্ণয়ের জন্য অতি সামান্য পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ (যাকে বলা হয় 'radiopharmaceuticals', অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় ওষুধপত্র/ভেষজ) ব্যবহার করা হয় এক্ষেত্রে। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে, শ্বাস গ্রহণের সাথে অথবা মুখের মধ্য দিয়ে রোগীর শরীরে তা প্রবেশ করানো হয়। তবে যেভাবেই তা করা হোক, দেহের রোগাক্রান্ত অংশে পৌঁছে এই তেজস্ক্রিয় ওষুধপত্র নির্দিষ্ট সেই জায়গাতেই অবস্থান করে। ফলে, 'Gamma Scientigraphy' নামক বিশেষ টেকনিক ব্যবহার করে, কোনও নির্দিষ্ট জিন/ক্রোমোজোম যে জায়গায় অবস্থান করে (Loci) তার ছবি (image) পাওয়া সম্ভব হয়। তেজস্ক্রিয় ওষুধপত্র তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে আশপাশের অন্যান্য নিরোগ/স্বাভাবিক কোষকলার উপর কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করেই দেহের নির্দিষ্ট রোগাক্রান্ত অংশে 'Cytotoxic' (কোষ ধ্বংসকারী) মাত্রার বিকিরণ ঘটায়। এই পদ্ধতি এমনকী শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজকর্মের অস্বাভাবিকতাকে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েও চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। ক্যান্সার তথা অ্যালঝাইমার্স ও পারকিনসনস্ রোগের মতো স্নায়ুঘটিত বৈকল্য, হৃৎপিণ্ড তথা রক্তবাহ সম্পর্কিত (Cardiovascular) রোগব্যাধির ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়েই রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই বিশেষ ধারা ইতোমধ্যেই তার উপযোগিতার প্রমাণ রেখেছে। ফলত, আগেভাগে চিকিৎসা শুরু করা যাচ্ছে; অসুস্থতা এবং মৃত্যুর ঘটনা কমানো সম্ভব হচ্ছে। 'ইমেজিং'-এর ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত আইসোটোপগুলি হল ^{99m}TC, ^{123}I, ^{201}TI, ^{111}In এবং ^{18}F। আর রোগ নির্ণয় বা 'ডায়াগনোস্টিক নিউক্লিয়ার মেডিসিন' ক্ষেত্রে

সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, তা হল 'Technetium-99m'। পরিসংখ্যান বলছে, বছরে প্রায় ২৫০ লক্ষ 'ডায়াগনোস্টিক নিউক্লিয়ার মেডিসিন' সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রেই উল্লিখিত আইসোটোপটি ব্যবহার করা হয়। 'Position Emission Tomography' (PET) স্ক্যানিং সুবিধা-সহ 'মেডিক্যাল সাইক্লোট্রন' তৈরি করা হয়েছে BARC-এর 'রেডিয়েশন মেডিসিন সেন্টার (RMC)-এ। এই সাইক্লোট্রনে নিয়মিতভাবে ^{18}F লেবেলের ফ্লুডিঅক্সিগ্লুকোজ (FDG) অণু উৎপাদন করা হয় ক্যান্সার নির্ণয় তথা হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিকতা চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহারের জন্য। ২০১৫ সালে ^{18}F-FDG, ^{18}F-FLT, ^{18}F-NaF এবং ^{18}F-FMISO-এর সবসমেত প্রায় ১৩৩-টির মতো 'PET রেডিওফার্মাসিউটিক্যালস্'-এর চালান সরবরাহ করা হয় মুম্বাই ও তার আশপাশের এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন হাসপাতালে। এই চালানের মোট ^{18}F তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ প্রায় ^{240}Ci। উল্লেখ করা যেতে পারে 'Curie' (যার চিহ্ন Ci) হল তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের একক।

● **টার্গেটেড রেডিওনিউক্লাইড থেরাপি :** নিউক্লীয় মেডিসিনের দুনিয়ায় অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্র হল এই বিশেষ থেরাপি বা চিকিৎসা পদ্ধতি। রোগের উপশম তথা চিকিৎসার এই বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় ওষুধপত্রের বৈশিষ্ট্য হল তা তৈরিতে যে রেডিওনিউক্লাইড ব্যবহার করা হয়, তা থেকে বিটা রশ্মির নিঃসরণ হয়। এই সব রেডিওনিউক্লাইড এমনভাবে বানানো হয় যে তা থেকে শরীরের নির্দিষ্ট রোগাক্রান্ত অংশে রোগ উপশমের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে আয়নিত বিকিরণ (ionizing radiation) পৌঁছায়। ^{131}I, ^{177}Lu, ^{32}P, ^{153}SM এবং ^{188}Re-এর মতো রেডিওনিউক্লাইডস ভিত্তিক এই থেরাপির জন্য দরকারি বহুবিধ রেডিওফার্মাসিউটিক্যালস্-এর বিকাশ ঘটিয়েছে BARC। বিভিন্ন 'নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টারে তা সরবরাহ করে থাকে এই প্রতিষ্ঠান। নিউরোএন্ডোক্রিন ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় ^{177}Lu-DOTA-TATE; অন্যদিকে ^{153}Sm-EDTMP এবং ^{177}Lu-EDTMP ব্যবহার করা হয় হাড়ের ব্যাথা প্রশমনের জন্য। BARC-এর 'রেডিয়েশন মেডিসিন সেন্টার'-এ থাইরয়েড সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা উপশমে, যার মধ্যে পড়ে থাইরয়েড ক্যান্সারের সব ধরনের চিকিৎসাও, ^{131}I ব্যবহার করে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। ২০১৫ সালে BARC-এ প্রস্তুত রেডিওফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রয়োগ করে ৪০ হাজারেরও বেশি রোগীর ব্যাধি নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা করা হয়েছে।

● **রেডিয়েশন থেরাপি :**

এই বিশেষ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিতে উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন বিকিরণ ব্যবহার করা হয়। বিশেষ মেশিনের সাহায্যে অথবা তেজস্ক্রিয় পদার্থের মাধ্যমে। যখন কোনও মেশিন ব্যবহার করে বিকিরণ রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তাকে বলে 'বহিরাগত রশ্মি বিকিরণ থেরাপি' (External-beam radiation therapy) বা 'টেলি-থেরাপি'। পক্ষান্তরে, অনেক ক্ষেত্রে, রোগীর শরীরের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকলার কাছেপিঠে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রবিষ্ট করিয়ে যখন চিকিৎসা করা হয়, তাকে বলে 'অভ্যন্তরীণ বিকিরণ থেরাপি' (Internal radiation therapy) বা ব্রাকিথেরাপি (Brachytherapy)। এই বিকিরণ থেরাপির উদ্দেশ্য হল টিউমার বা শরীরের রোগাক্রান্ত অংশে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিকিরণ প্রবিষ্ট করিয়ে ম্যালিগন্যান্ট বা মারণ কোষগুলিকে ধ্বংস করা।

(i) **এক্সটার্নাল বিম রেডিওথেরাপি :** এই থেরাপির ক্ষেত্রে সাধারণত একটি মেশিন, হয় '^{60}Co-টেলি-থেরাপি ইউনিট' বা 'লিনিয়্যার এক্সিলারেটর' ব্যবহার করে, দেহের যে অংশে চিকিৎসা দরকার, তার উপর উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন বিকিরণ রশ্মি ফেলা হয়। এই রেডিওথেরাপি ব্যবহার করা যেতে পারে স্তন ক্যান্সার, অন্ত্রের ক্যান্সার, মাথা ও গ্রীবার ক্যান্সার তথা ফুসফুসের ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য। একটি টেলি-থেরাপি মেশিন, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ভাবাট্রন' (Bhabhatron); তার নক্শা প্রস্তুত করেছে BARC। দেশের প্রায় ৫০-টি ক্যান্সার হাসপাতালে বসানো হয়েছে 'ভাবাট্রন'। বিদেশ থেকে আমদানি করা যে কোনও টেলি-কোবাল্ট মেশিনের তুলনায় দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই মেশিন দরেও সস্তা এবং গুণমানেও উন্নত। চিকিৎসা শুরু করার আগে, দেহের যে অংশে রেডিওথেরাপি করা দরকার, সেই নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করা এবং চিকিৎসার প্ল্যান যাচাই করে দেখার জন্য 'Imagine' সিমুলেটর তৈরি করেছে BARC।

(ii) **ব্রাকিথেরাপি :** অভ্যন্তরীণ রেডিও নিউক্লাইড থেরাপির ক্ষেত্রে রোগের চিকিৎসা করা হয় দেহের রোগাক্রান্ত নির্দিষ্ট অংশ বা তার কাছাকাছি সিল করা তেজস্ক্রিয় উৎস (স্থায়ী বা সাময়িকভাবে) প্রবিষ্ট করিয়ে। এক্সটার্নাল বিম রেডিওথেরাপির তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় বিকিরণ ব্যবহার করে ক্যান্সারের চিকিৎসা করা সম্ভবপর হয় এই ব্রাকিথেরাপি পদ্ধতিতে। কিছু কেস-এ প্রবিষ্ট তেজস্ক্রিয় উৎস রোগীর শরীরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রেখে দেওয়া হয়। এই সময়ের স্থায়িত্ব কয়েক মিনিট থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত হতে পারে। সাময়িকভাবে যে তেজস্ক্রিয় উৎস রোগীর দেহের মধ্যে রাখা হয় তার জন্য অন্যতম পছন্দসই আইসোটোপ হল Iridium-192। আর স্থায়ীভাবে রোগীর দেহের মধ্যস্থ টিউমার বা রোগাক্রান্ত অংশে রেখে দেওয়া হয় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিঃসরণকারী বীজ। ধীরে ধীরে সময় গড়িয়ে সপ্তাহ থেকে মাস পেরিয়ে এক সময় এই তেজস্ক্রিয় উৎস থেকে বিকিরণের মাত্রা কমতে কমতে প্রায় শূন্যে পৌঁছায়। শেষমেশ, এই তেজস্ক্রিয় বীজ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; রোগাক্রান্ত যে অংশে থেরাপি হয়, তার উপর এর আর কোনও প্রভাব থাকে না। স্থায়ী ব্রাকিথেরাপি মূলত প্রস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অতি সূক্ষ্ম টাইটানিয়াম মোড়কে Iodine-125 বীজ প্রস্তুত করে BARC চক্ষু ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন রাস্তা দেখিয়েছে। বর্তমানে তিনটি হাসপাতালে 'BARC I-125 Ocu-Prosta Seeds' ব্যবহার করা হয়। এই বিকিরণ উৎস ব্যবহার করে এখনও

পর্যন্ত ১২০ জন রোগীর চক্ষু চিকিৎসা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসায় স্থায়ী বিকিরণ উৎস হিসাবে এই 'BARC I-125 Ocu-Prosta Seeds' ব্যবহারের সম্ভাবনা যাচাই করা হচ্ছে একটি হাসপাতালে। তবে তা এখনও ক্লিনিক্যাল টেস্টের পর্যায়েই আছে। দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছাকাছি অংশে ত্বকের ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য বিটা-রশ্মি নিঃসরণকারী রেডিওনিউক্লাইডস প্রয়োগ করে ব্রাকিথেরাপি এক সম্ভাব্য বিকল্প। ^{32}p উৎস প্রস্তুত করার জন্য BARC একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। ক্লিনিক্যাল টেস্টের আগের পর্যায়গুলি সফলভাবে সম্পন্ন করা গেছে। এবার এই ^{32}p উৎসকে নিয়ে ক্লিনিক্যাল টেস্ট চালানো হচ্ছে নয়াদিল্লির AIIMS হাসপাতালে।

খাদ্য সুরক্ষা—খাদ্য ভাণ্ডারে বাড়তি জোগান

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতে তাক লাগানো অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করা গেছে। কিন্তু দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমাদের কৃষি সম্পদের উপর বিপুল চাহিদার ফাঁস ক্রমশ চেপে বসছে। সমস্যা আরও ঘোরালো হয়েছে এ কারণে যে, দেশের অর্থনীতিতে কৃষির অংশভাগ ক্রমশ কমছে; খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে। এই পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাপনার পথে হাঁটা জরুরি হয়ে পড়েছে। যাতে করে, দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সবাইকে সামিল করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য খাদ্য, পুষ্টি, পরিবেশ এবং জীবিকা নির্বাহের মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে সুরক্ষা অর্জনে সাফল্য পাওয়া যায়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত ইস্যুগুলির মোকাবিলা করার জন্য আয়নিত বিকিরণভিত্তিক চালু প্রযুক্তির ব্যবহার সুফল দিতে পারে। কারণ এই ধরনের প্রযুক্তির প্রয়োগ নিরাপদ, স্বাস্থ্যবিধান সম্মত এবং আর্থিক দিক থেকে লাভজনক।

● **নিউক্লীয় কৃষিকাজ :**

গত কয়েক দশক ধরেই, BARC আয়নিত বিকিরণ প্রয়োগ করে শস্য প্রজননের ক্ষেত্রে 'পরিব্যক্তি' বা 'মিউটেশন'-এর মাধ্যমে উন্নত প্রজাতি উদ্ভাবন কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। দেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য ভারতীয় কৃষকদের হাতে BARC ইতোমধ্যেই বিভিন্ন শস্যের ৪২-টি উন্নত প্রজাতি তুলে দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নতুন জাতের সব চিনেবাদাম, মুগ ডাল, ছোলা, মটর, সয়াবিন, বরবটি, সরষে, সূর্যমুখী এবং ধান। এই সমস্ত প্রজাতির মধ্যেই এক বা একাধিক উন্নততর এবং বাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছে। যেমন—উচ্চফলনশীলতা, বড়ো মাপের শস্যদানা, অনেক কম সময়েই ফসল পরিপক্ক হচ্ছে। এছাড়াও এ ধরনের শস্য প্রজাতির মধ্যে ফসলের অনিষ্টকারী বিবিধ জৈব এবং অজৈব শত্রুর মোকাবিলা করার মতো প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে। ধান এবং গমের ক্ষেত্রে ফলন বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য 'মিউটেশন' ঘটিয়ে আরও উন্নত প্রজাতি সৃষ্টির জন্য চেষ্টাচরিত্র করা হচ্ছে অনেকদিন ধরেই। ধাত্রী উদ্ভিদ-এর দেহাংশ (Stock Plant Material) থেকে খুব কম সময়ের মধ্যে দ্রুত কোষকলার বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে বহুসংখ্যক চারা গাছ (Progeny plant) উৎপন্ন করার জন্য 'Micropropagation' প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এভাবে উন্নততর জাতের কলা, আখ, আঙুর, আনারস, আলু, হলুদ, আদা চাষ করা হচ্ছে।

● **খাদ্য সংরক্ষণ-উৎপাদন ও সংরক্ষণ :**

ফসল বিনষ্টকারী কীটের প্রাদুর্ভাব খাদ্য সুরক্ষা তথা খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আর একটি বড়ো প্রতিবন্ধকতা। ভারত-সহ গোটা বিশ্ব জুড়েই এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ভালোরকম মার খায়। ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম দুর্ভাগ্য হল, উৎপাদিত ফসলের মোটামুটি ৩০ শতাংশই নষ্ট হয়ে যায় কীটপতঙ্গের আক্রমণ, ফসলের রোগ সংক্রমণ, পচন ইত্যাদি কারণে। এই উদ্বেগজনক বিষয়টির মোকাবিলা করতে বীজ/চারা বপন থেকে শুরু করে ফসল ওঠা পর্যন্ত এবং তার পরেও তা মজুত, গোটা পর্ব জুড়েই সচেষ্ট হতে হবে। খাদ্যশস্য এবং অর্থকরী ফসল উভয় ক্ষেত্রেই তা জরুরি। ফসল ওঠার পর শস্যের অপচয় রোধ করতে উৎপাদন ও বাজারে তার চাহিদা সৃষ্টি এই দুইয়ের মধ্যে সময়ের ফারাক কমানো কার্যকর পন্থা হতে পারে। ভারতীয় অর্থনীতিকে আরও জোরদার করে তুলতে হলে একদিকে ফলন বাড়াতে হবে, অন্যদিকে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য অন্নসংস্থান করতে হবে। আর এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে যে বিষয়টি, তাহল কৃষিজ উৎপাদনের সংরক্ষণ।

কীটপতঙ্গের নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হল রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার। এই পদ্ধতি, তথা কীট দমনে চালু অন্যান্য আরও যেসব পথে হাঁটা হয় তা সবই বিভিন্ন সমস্যা ডেকে আনে। মানুষের শরীরস্বাস্থ্যের উপর এর সম্ভাব্য কুপ্রভাব এরকমই একটা বিষয়। এছাড়াও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তার উপর আবার দীর্ঘ দিন এই সব কৃত্রিম রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের দরুন ফসল বিনষ্টকারী কীটের শরীরে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। রাসায়নিক কীটনাশক এবং ফসলের রোগ সংক্রমণ মুক্তির জন্য অণুজীবের ব্যবহার মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। পক্ষান্তরে, বিকিরণ প্রয়োগ করে খাদ্যের প্রক্রিয়াকরণ (Radiation processing) এক অনেক বেশি কার্যকর, পরিবেশ-বান্ধব এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে সুবিধাজনক বিকল্প হতে পারে; খাদ্যে রাসায়নিক ও অণুজীবঘটিত প্রদূষণের হাত থেকে নিস্তার পেতে। দেশের (খাদ্য পণ্য) সরবরাহ শৃঙ্খলে এইভাবে প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যদ্রব্য (Irradiated foods)-কে সামিল ও সংহত করা আশু জরুরি। দেশে খাদ্য সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য এই প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচার-প্রসারকে উৎসাহিত করাও দরকার। এই পদ্ধতিতে খাদ্য এবং কৃষিজ পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রিত মাত্রার আয়নিত বিকিরণ শক্তি বা Radiant energy, (অর্থাৎ, সরাসরি সংস্পর্শে না এসেও যে শক্তি পরিবাহিত হয়) সম্পাত করে বিবিধ কাঙ্ক্ষিত সুফল মেলে। এইভাবে প্রক্রিয়াকৃত মজুত করা খাদ্য/পণ্য পোকামাকড়, ইঁদুর ইত্যাদির উৎপাত থেকে নিরাপদ থাকে। আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট কীটের (Quarantine pest) সংস্পর্শে আসা খাদ্য/শস্য/পণ্যের আমদানি-রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এসব কীটের হাত থেকেও পরিত্রাণ সম্ভব এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে খাদ্যপণ্যের প্রক্রিয়াকরণের সাহায্যে। এছাড়াও এ ধরনের প্রক্রিয়াকৃত পাকা ফল ও পরিপুষ্ট সবজি বহু দিন সতেজ থাকে, সহজে তাতে পচন ধরে না। আলু, পেঁয়াজ, আদা, রসুনের মতো কন্দ জাতীয় ফসলে হিমঘরে সঞ্চিত থাকা অবস্থায় অঙ্কুরোদ্‌গমের সম্ভাবনা থাকে না। খাদ্যের পচনশীলতার জন্য দায়ি জীবাণুর বিনাশ হয়। খাদ্যদ্রব্য স্থিত পরজীবী এবং জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক অন্যান্য অণুজীব বিনষ্ট হয়। কাঁচা এবং হিমায়িত খাদ্যে ব্যাকটেরিয়ার মতো রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের সংক্রমণ রোধ করারও একমাত্র পথ এইভাবে প্রক্রিয়াকরণ। মোড়কজাত করার আগে, এমনকী হিমায়িত অবস্থাতেও পণ্যের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। সরাসরি আয়নিত বিকিরণ শক্তি সম্পাতের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ হলেও কোনওভাবেই তা সংশ্লিষ্ট খাদ্যপণ্যকে তেজস্ক্রিয় করে না। 'খাদ্য সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা' সুনিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুণমান সংক্রান্ত বাধানিষেধ এড়াতে বিকিরণের মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকে অনুমোদন করেছে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। যেমন—আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA), রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), কনডেক্স এলিমেনটেরিয়াস কমিশন (CAC-১৮০-রও বেশি সদস্য দেশের এক অন্তর্রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান), যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (USDA), ফুড স্ট্যান্ডার্ডস অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড (FSANZ) তথা ভারতীয় খাদ্য সুরক্ষা এবং মানক কর্তৃপক্ষ (FSSAI)। সম্প্রতি, আন্তর্জাতিক প্রনিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতে বিকিরণের প্রয়োগে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত বিধিনিয়ম চালু করা হয়েছে। এইভাবে প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যবস্তুর শ্রেণি অনুযায়ী ছাড়পত্র দেওয়ার কাজটি করে FSSAI। গোটা বিশ্বে ৬০-এরও বেশি ধরনের খাদ্য এইভাবে প্রক্রিয়াকৃত করা হয়। এর মধ্যে পড়ছে বিভিন্ন ধরনের মশলা, শস্যদানা, দানাশস্য থেকে তৈরি পণ্য, ফল, তরিতরকারি এবং মাংস। এই জায়গায় এসে, BARC ফল (লিচু আম, চেরি) এবং সবজি (আলু, পেঁয়াজ), সামুদ্রিক খাদ্য, মশলা (হলুদ, লঙ্কা) ইত্যাদি সংরক্ষিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির (Irradiation technologies) বিকাশ ঘটিয়েছে। বাণিজ্যিক পরিসরে এমন বহু প্রযুক্তির সাক্ষাৎ মেলে। ভারতে বর্তমানে ১৫-টি 'ফুড ইরেডিয়েশন ফেসিলিটি' চালু আছে। এর মধ্যে একটি নাসিকে; এবং নিয়মিত ব্যবহার করা হয় আলু, পেঁয়াজ ও আম-এর সংরক্ষণ, পচন ঠেকিয়ে দীর্ঘ দিন সতেজ রাখা তথা এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে প্রোৎসাহিত করার জন্য বিকিরণ প্রয়োগের মাধ্যমে এই তিন ধরনের ফসলেরপ্রক্রিয়াকরণের কাজে। ভারতে এইভাবে প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যের অংশভাক্ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত নভি মুম্বাইয়ে ভাশি এলাকাস্থিত এক 'রেডিয়েশন প্রসেসিং প্ল্যান্টে' সর্বমোট প্রায় ৩৪ হাজার টন খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াকৃত করা হয়েছে। এইভাবে প্রক্রিয়াকৃত আম ২০০৭ সাল থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়ে আসছে। এই বিশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রসার ঘটছে বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সংক্ষিপ্তসার হল, এটা মনে রাখা জরুরি যে, সবুজ বিপ্লবের সৌজন্যে দেশে দশকের পর দশক ধরে সন্দেহাতীতভাবে মজুত খাদ্য ভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও আগামী দশকগুলিতে চাহিদার নিরিখে আমরা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছি। কাজেই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি দরকার। শস্যের ফলন এবং গুণমান বাড়ানোর জন্য চলতি এই সমস্ত প্রযুক্তি/প্রকৌশল যাচাই করে পরিমার্জন দরকার। আয়নিত বিকিরণ শক্তিকে কাজে লাগানোর যে কৌশল ইতোমধ্যেই অবলম্বন করা হয়েছে, কৃষিক্ষেত্রে পাশা উল্টে দেওয়ার মতো সম্ভাবনা আছে। এবং এই সূত্রেই আমাদের জাতি সমৃদ্ধির পথে দ্রুত এগোবে।

শক্তি নিরাপত্তা-পরমাণু শক্তি, পরিচ্ছন্ন এবং সবুজ

● **বিশ্ব উষ্ণায়ন—এক বিপজ্জনক খাড়াই :**

গত কয়েক বছর ধরেই জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্ত সূচক এক অনিবার্য পরিণতির দিকেই আঙুল তুলছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের দাপটে জেরবার পৃথিবী গ্রহ জলবায়ু পরিবর্তনের সূত্রে এক অতি বিপজ্জনক খাড়াই কিনারায় এসে পৌঁছেছে। আবহমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা নজিরবিহীনভাবে ৪০০ ppm-এ পৌঁছেছে। মূলত গত তিন দশকে উষ্ণতা বেড়েছে ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও বেশি। উষ্ণতার এই বৃদ্ধি জলবায়ু উপর মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলেছে। ফলত, সমুদ্রের জলতল বাড়ছে, ঘনঘন তীব্র তাপপ্রবাহ, অপ্রত্যাশিত বৃষ্টি ও ঝড়ঝঞ্ঝায় আমরা ইতোমধ্যেই নাজেহাল। এসবের মূল কারণ হল মানুষের কর্মকাণ্ডের ধরনধারণ। গত কয়েক দশক ধরে মানুষের কর্মকাণ্ডের দরুন জীবাশ্ম জ্বালানি; অর্থাৎ কাঠ, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের ব্যবহার বহুগুণ বেড়ে আবহমণ্ডলের উপর উত্তরোত্তর চাপ বাড়ছে।

● **পরমাণু শক্তি লক্ষ্য—সামনের পথ :**

সময়ের সাথে সাথে, আরও বেশি বেশি করে প্রমাণিত হচ্ছে, বিশ্ব উষ্ণায়ন সমস্যার এক বাস্তব সমাধান জোগাতে চলেছে পরমাণু বা নিউক্লীয় শক্তি। যদিও তা ঘিরে একটা আশঙ্কার বাতাবরণ এখনও জনমানসে বজায় আছে। শক্তি/বিদ্যুৎ উৎপাদনের যাবতীয় উৎস, এমনকী সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ এবং বায়ুশক্তির মতো অপ্রচলিত/পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসগুলি তুলনাতেও সব চেয়ে কম কার্বন ফুটপ্রিন্ট তকমায় ভূষিত পরমাণু শক্তি। ভারত এক অতি দ্রুত বৃদ্ধির অর্থনীতি; কার্বন নিঃসরণ কম করার আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার অনেকটাই বর্তায় এ দেশের উপর। কাজেই আজকের দিনে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের রাস্তায় দ্রুত অগ্রসর হতে হবে ভারতকে। দেশে চালু প্ল্যান্টের সংখ্যা বর্তমানে ২১; আরও ১২-টি প্ল্যান্ট অপেক্ষায়

লাইনে। কাজেই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বৃদ্ধির নিরিখে আমরা এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যে, আগামীতে সম্ভাবনা যথেষ্ট। আগামী কয়েক দশকে শক্তি নিরাপত্তা জোগানো এবং জলবায়ুর চরমভাবাপন্নতা প্রশমনে পরমাণু শক্তি ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলেই মনে হয়।

সামাজিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ

● **আবর্জনা—বর্জ্য থেকে সম্পদ :**

প্রতিদিন ভারতে বিপুল পরিমাণ নিকাশী আবর্জনা উৎপন্ন হয়। এই সব আবর্জনার মধ্যে থিক থিক করে সংক্রামক অণুজীব। এই নিকাশী বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত না করা গেলে, তার ফলস্বরূপ রোগ ছড়িয়ে পড়বে, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনবে। একই সাথে, এই বর্জ্যের মধ্যে থাকে মাইক্রো এবং ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টস্, বিশেষত জৈব কার্বন; যা কিনা মাটির স্বাস্থ্য এবং ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী। বিকিরণ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিকাশী আবর্জনাকে ক্ষতিকর জীবাণু মুক্ত করে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা হয়। একই সাথে, চাষাবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য বাঞ্ছনীয় গুণমানের সার উৎপাদন করা হয়। আমেদাবাদ পৌর নিগম ভারতে এ ধরনের প্রথম প্ল্যান্ট তৈরির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এখানে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় প্রতিদিন ১০০ টন বর্জ্য আবর্জনা পরিশোধন ও সার উৎপাদিত হয়। এই ধরনের 'ইরেডিয়েশন ফেসিলিটি' গড়ে তুলে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় জায়গাতেই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে গোটা শহরের বর্জ্য আবর্জনার পরিশোধন সম্ভব। স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্মসূচির লক্ষ্যগুলি পূরণে এই প্রযুক্তির বিশেষ অবদান রাখার জোরদার সম্ভাবনা রয়েছে।

● **হাইড্রোজেল—ক্ষত নিরাময় :**

হাইড্রোজেন হল 'জেল' বা কঠিন জেলির মতো বস্তুর এক পাতলা স্বচ্ছ চাদর। এই অসাধারণ চিকিৎসা উপকরণটি মূলত অগ্নিদগ্ধ রোগীর এবং ক্ষতস্থান ড্রেসিং করার কাজে অত্যন্ত উপযোগী। PVA (পলিভিনাইল অ্যালকোহল—জলে দ্রাব্য এক কৃত্রিম পলিমার)-এর মতো হাইড্রোফিলিক পলিমার অণুর 'ক্রশ লিংকিং'-এর মাধ্যমে তৈরি করা হয় হাইড্রোজেল; রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে অথবা গামা রশ্মি/ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণের মাধ্যমে। 'জেল'-এর মতো গঠনের একটি ত্রিমাত্রিক (3D) নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, যা প্রচুর পরিমাণে জল ধরে রাখে। গামা রশ্মি বিকিরণের প্রয়োগে একই সাথে জেল তৈরি এবং নির্বীজনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

জীবাণুমুক্ত আচ্ছাদনের মাধ্যমে ক্ষতস্থানে নিয়ন্ত্রিত অক্সিজেন সরবরাহ হয় বলে হাইড্রোজেলের ব্যবহারে ক্ষতের উপরটা সবসময় আর্দ্র থাকে; ঠাণ্ডাভাব অনুভূত হয়। হাইড্রোজেল খুব দৃঢ় কিন্তু কোমলভাবে ত্বকের স্বাভাবিক অংশের সাথে লেগে থাকে, কিন্তু আর্দ্র ক্ষতস্থানের সাথে নয়। ফলত, ক্ষতস্থান ড্রেসিং করার সময় রোগী কোনও ব্যথাবেদনা অনুভব করেন না। যেহেতু এই জেলের চাদর স্বচ্ছ, তাই ক্ষতস্থান কতটা শুকোচ্ছে/নিরাময় হচ্ছে তা সহজেই চাক্ষুস করা যায়। এই জেল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দামেও সস্তা এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য। এই জেল তৈরির পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছেন BARC-এর বৈজ্ঞানিকরা, পরে বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য সেই প্রযুক্তি হস্তান্তরিত করা হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প পণ্য এবং সস্তা দরে ভারতের বাজারে তা সহজে পাওয়া যায়।

● **জল—জীবনদায়ী :**

মূলত গার্হস্থ্য, কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে এই সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার দৌলতে আজকের দিনে জল এক দুষ্প্রাপ্য পণ্য হয়ে উঠেছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোগান বাড়াতে ভূ-গর্ভস্থ জলসম্পদের নতুন এবং নবীকরণযোগ্য উৎস খুঁজে দেখাটা নেহাৎই জরুরি। এই ধরনের উৎস একেবারে সঠিকভাবে খুঁজে পেতে তথা সঞ্চিত জলসম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করতে 'আইসোটোপ হাইড্রোলজি টেকনিক' অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়াও এই পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে আরও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য জানা যায়। যেমন—ভূ-গর্ভস্থ জলের উৎপত্তি, কত দিন ধরে তা সঞ্চিত আছে, বণ্টনের প্রকৃতি ইত্যাদি। তাছাড়াও, ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-তল জলের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগসূত্র এবং 'অ্যাকুইফার' নামক জলসম্পৃক্ত মাটির নিচের প্রস্তর স্তরের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের পুনরুজ্জীবন ব্যবস্থা (Aquifer recharge systems)-র সম্পর্কে তথ্য মেলে। ভূ-তল জলসম্পদের উৎসের উপর নজরদারি চালানোর জন্যও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বাঁধের গায়ে এবং সেচ খালে ফাটল খুঁজতে; হ্রদ এবং জলাধারগুলিতে জলসম্পদের মজুত, প্রবাহ হার, নদীতে জল ছাড়ার পরিমাণ এবং পলি সঞ্চয়ের হার ইত্যাদি। এইভাবে প্রাপ্ত তথ্য-পরিসংখ্যান এই সব জলসম্পদ সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও এর উৎসের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনার কাজে লাগানো হয়। জল দূষণকারী বিষাক্ত কলুষ পদার্থ ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা সস্তা দরের সহজে ব্যবহার্য 'কিট' তৈরি করেছেন। ভূ-গর্ভস্থ জলে ফ্লোরিন এবং গঙ্গার জলে ক্রোমিয়াম-এর মতো বিষাক্ত কলুষ পদার্থ চিহ্নিত করতে এই কিট ব্যবহার করা হচ্ছে। BARC-এর প্রযুক্তিবিদ্‌রা এছাড়াও এক ধরনের ঝিল্লি বা অতি সূক্ষ্ম পর্দার মতো পরিস্রাবণ (Membrane for Filtration) প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়েছেন, জলে ব্যাকটেরিয়ার মতো অণুজীব ছেঁকে বাদ দেওয়ার জন্য তথা সামান্য লবণাক্ত ও সাগরের জলেরও লবণাক্ততা দূর করতে, জল শোধনের এই সমস্ত প্রযুক্তিই দেশের শিল্পক্ষেত্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই সমাজের একটা বড়ো অংশের কাছে সস্তা দরে প্রযুক্তিগত সমাধান পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে।

শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ

দেশের শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষত ম্যানুফ্যাকচারিং বা শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে বহুভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বিকিরণ প্রযুক্তি। এইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োগের একটা সংক্ষিপ্ত ছবি এখানে পেশ করা হল।

● **চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত সামগ্রীর বিকিরণের মাধ্যমে নির্বীজন :**

সিরিঞ্জ, তুলোর বান্ডিল, অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের ড্রেসিং, শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত দস্তানা, হৃৎপিণ্ডের (কৃত্রিম) ভালভ্, ব্যান্ডেজ, প্লাস্টিক

ও রবারের চাদর, শল্য চিকিৎসায় ছুরি-কাঁচির মতো যন্ত্র, পাউডার, মলম, দ্রবণ ইত্যাদি সামগ্রী, তথা কোষকলা প্রতিস্থাপনের (tissue grafting) জন্যে অস্থি, স্নায়ু, ত্বক-এর মতো দেহাংশ (biological preparation) বিকিরণ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে নির্বীজন বা জীবাণু মুক্ত করা হয়।

● **রেডিওগ্রাফি :**

এক্স-রে মেশিনের তুলনায় গামা রশ্মি নিঃসরণকারী তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ একদিকে যেমন সহজেই বহনযোগ্য; অন্যদিকে তেমনি উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিকিরণ দিতে সক্ষম। কাজেই প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের নতুন পাইপ লাইন বসানোর সময় জোড় পরীক্ষার ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় উৎসকে পাইপের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে জোড়ের বাইরে রাখা হয় ফিল্ম। এছাড়াও 'নিউট্রন রেডিওগ্রাফি'/'অটোরেডিওগ্রাফি'-র মতো ভিন্ন ধরনের রেডিওগ্রাফি প্রয়োগ করে পদার্থের বেধ এবং ঘনত্বের পরিমাপ, উপাদানের অবস্থান নির্ণয় সম্ভব, যদি তা অন্য কোনওভাবে জানা সম্ভব নাও হয়।

ভবিষ্যতের ঈষৎ রূপরেখা

এই নিবন্ধের লক্ষ্য হল পাঠকদের কাছে একটাই বার্তা পৌঁছানো। পরমাণু প্রযুক্তির প্রয়োগের পরিসর ছড়িয়ে রয়েছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। যাকে কাজে লাগালে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সুফল প্রাপ্তির দিকে জাতির এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। অনাগত ভবিষ্যতের চিত্রটা কিন্তু আমাদের কাছে অনেকটাই স্পষ্ট। উল্লিখিত পরমাণু প্রযুক্তির দৌলতে প্রাপ্ত সুফল কিন্তু এই ভবিষ্যতের বেশ অনেকটা সময় পর্যন্ত আমাদের নিশ্চিন্ত রাখতে পারে; যেহেতু প্রয়োগের ধরনধারণ এবং পরিসরের নিরিখে এই সব প্রযুক্তি মোটের উপর প্রায় অপরিবর্তনযোগ্য। পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন অবশ্যই এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বর্তমানে গোটা বিশ্বেই শক্তি ভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে এই ক্ষেত্রের। তা সত্ত্বেও একে ঘিরে সন্দেহ ও আশঙ্কার বাতাবরণ গড়ে ওঠায় দুর্ভাগ্যবশত এই ক্ষেত্রের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। চূড়ান্ত কার্বন বান্ধব এই শক্তি উৎস ঝাঁপ বন্ধ করার দিকে এগোচ্ছে। সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়ু শক্তি এবং ভূ-তাপীয়-এর মতো পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎসের দিকে ফোকাসটা সরে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত, পরমাণু শক্তির তুলনায় এদের কার্বন ফুটপ্রিন্টই শুধু অতি উচ্চমাত্রায় নয়; ধরনও অপ্রত্যাশিত এবং উৎপাদনের পরিমাণও এত কম যে, বহু দেশের প্রাথমিক চাহিদার চাপটুকুও সামাল দিতে অপারগ। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই, আরও বেশি মাত্রার কার্বন ফুটপ্রিন্ট বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এর দরুণ বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ইস্যুগুলির দিগন্তে আশঙ্কার মেঘ গাঢ় হতে থাকলেও। এই সঙ্গিন পরিস্থিতিতে, বিশ্বকে আবেগতাড়িত না হয়ে একটা সোজাসাপটা সিদ্ধান্ত নিতে এগিয়ে আসতে হবে। শক্তি ভাণ্ডারে পারমাণবিক বিদ্যুতের অংশভাক্ কমানোর প্রচেষ্টাকে ত্যাগ করতে হবে। প্রায় সমস্ত দিক থেকেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করে আসছে। তা সে প্ল্যান্টের অপারেশনের হোক বা নিরাপত্তার খতিয়ানই হোক; উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার হোক বা কার্বন ফুটপ্রিন্টই হোক তথা বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণের নিরিখেই হোক। মূলত যে ইস্যুতে তর্কবিতর্কের ঝাঁঝ ক্রমশ বাড়ছে তা হল, এই পরমাণু বর্জ্যের মজুতের কী বন্দোবস্ত হবে? উল্লেখ্য, এই ধরনের বর্জ্য বহুদিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। সম্প্রতি এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার স্তরে এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকেও অনেকটা অগ্রগতি এসেছে। নতুন ধরনের রিঅ্যাক্টর উদ্ভাবনের সূত্রে এই ইস্যুরও খুব দ্রুত সঠিক সমাধান-সূত্র মিলবে বলে আশা করা যেতেই পারে।❑

তথ্যসূত্র ও উল্লেখপঞ্জি :

★ Making of the Atomic Bomb, Richard Rhodes, Simon & Schuster, 1986.
★ The case of optimism on climate change, AI Gore, TEd Talk, 2016.
★ Averting the climate crisis, Al Gore, TED Talk, 2006.
★ Biology & Medicine : Excitement of Research and Deployment of its Outcome—The Twain Do Meet in BARC, Krishna B. Sainis, BARC Newsletter, Page vii, Sept-Oct 2013.
★ Industrial Applications of Radioisotopes, IANCAS Bulletin, Vol 16, June 2001.
★ Isotopes Application in Agriculture, IANCAS Bulletin, Vol VI, No. 4, November 2007.
★ Radiation Technology for Sewage Sludge Hygienisation, Lalit Varshney, BARC Newsletter, Page 41, No-Dec 2012.
★ The Liberation of the Environment, Jesse H. Ausubel, Internet Resource Agriculture and Food Security, SIRD, BARC Publication, 2013.
★ The many uses of Nuclear Technology, World Nuclear Association Website, Updated March 2014.
★ How fear of nuclear power is hurting the environment, Micahel Shellenberger, TED Talk, September 2016.
★ Peaceful Uses of Nuclear Energy : Meeting Societal Needs, Dr. Mohamed EI Baradei, IAEA, 15th Annual Conference of the Indian Nuclear Society (INSAC-2004), Mumbai, India.

(**লেখক পরিচিতি :** শ্রী ব্যাস ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র, মুম্বাই-এর অধিকর্তা। ইমেল : director@barc.gov.in; এবং শ্রী রমণমূর্তি BARC ট্রেনিং স্কুলের OCES কর্মসূচি রূপায়ণ বিভাগের প্রধান। ইমেল : mmurthi@barc.gov.in)

ভারতে কৃষি বিজ্ঞান গবেষণা

আর্থ-সামাজিক সুফল

*জাতীয় অর্থনীতিতে একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রেখেছে কৃষিক্ষেত্র। দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৫২ শতাংশের কর্মসংস্থান হয় এই ক্ষেত্রের দৌলতে। তাই, দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অবদান মাত্র ১৪ শতাংশ হলেও এই ক্ষেত্রের গুরুত্ব এখনও যথেষ্ট। দেশের একশো কোটিরও বেশি জনসংখ্যার খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করছে কৃষিক্ষেত্র। কৃষি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগগুলিতে কাঁচামালের জোগান দিচ্ছে। দেশের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসেও কৃষিক্ষেত্রের বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ তথা চূড়ান্ত প্রভাব রয়েছে। কৃষিকাজে যুক্ত মানুষজন, বৈজ্ঞানিক-গবেষক এবং নীতি নির্ধারকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র আজ গর্ব করার মতো জায়গায় এসে পৌঁছেছে। তাসত্ত্বেও, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ইস্যুগুলির প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে ভারতীয় কৃষি কত দিন তার উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে পারবে—সে প্রশ্ন ইতোমধ্যেই উঠছে। কৃষিক্ষেত্রের সামনে উঠে আসা এই সব সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান সম্ভব কেবল কৃষি গবেষণা ও বিকাশের মাধ্যমে নতুন নতুন চাহিদা-নির্ভর প্রযুক্তির বিকাশ/উদ্ভাবন তথা প্রসার/প্রয়োগের মাধ্যমে। এপথে অবশ্য দীর্ঘদিন আগেই পা রাখে ভারতীয় কৃষি। ষাটের দশকে সবুজ বিপ্লবের দৌলতে যার শুভারম্ভ। কিন্তু ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি মানে শুধু আরও বেশি শস্যের ফলন, আরও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নয়, এদেশের এত মানুষ এই ক্ষেত্রটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত যে, তার একটা বড়োসড়ো সামাজিক ভূমিকাও রয়েছে। লিখেছেন—***শান্ত কুমার*** *এবং* ***সুরেশ পাল***

ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবিকা সুরক্ষা অর্জন করছে কৃষির মাধ্যমে। সরাসরি দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৫২ শতাংশের রুটিরুজি জোগায় এই ক্ষেত্রই। অথচ, ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (GDP) কৃষির অবদান মাত্রই ১৪ শতাংশ। জাতীয় GDP-তে কৃষির অংশভাক ক্রমশ পড়তির দিকে হলেও মূলত দু'টি কারণে এই ক্ষেত্রের গুরুত্ব এখনও যথেষ্ট। প্রথমত, দেশের একশো কোটিরও বেশি জনসংখ্যার খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করছে কৃষিক্ষেত্র। দ্বিতীয়ত, দেশের কৃষি-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগগুলিকে কাঁচামালের জোগান দিচ্ছে। দেশের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসেও কৃষিক্ষেত্রের বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ তথা চূড়ান্ত প্রভাব রয়েছে।

কৃষিকাজে যুক্ত মানুষজন, বৈজ্ঞানিক এবং নীতি নির্ধারকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র আজ এই গর্ব করার মতো জায়গায় এসে পৌঁছেছে। গত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি চালু করার পর, গত পঞ্চাশ বছর ধরে, ১৯৬৫ থেকে ২০১৫-এর মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে, ভারতে ২৫২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। ওই বছর তৈলবীজের উৎপাদন ছিল ২৬০ লক্ষ টন, ডালের উৎপাদন ১৭০ লক্ষ টন, ফল এবং সবজির উৎপাদন ২৫৭০ লক্ষ টন এবং দুধের উৎপাদন ছিল ১৪৬০ লক্ষ টন। কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ব্যাপক বৃদ্ধির পেছনে সব চেয়ে বড়ো ভূমিকা নেয় জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থা (National Agricultural Research System—NARS)। তবে, আজকের দিনে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র বেশ কিছু নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। প্রথম প্রশ্নটিই হল, দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় কৃষি তার উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে পারবে কি না? দ্বিতীয়ত, লাভজনক হিসাবে কতদিন এই ক্ষেত্র টিঁকে থাকবে তথা এই লাভের পরিমাণ বাড়ানো কি আদৌ সম্ভব? দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনের চরম প্রভাবের ধাক্কা কি সামলে উঠতে পারবে ভারতীয় কৃষি? পাশাপাশি আর একটা বড়ো বিষয় হল, স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য ডাল এবং তৈলবীজের উৎপাদন অনেক অনেকটা বাড়াতে হবে। উৎপাদনশীলতার নিরিখে দীর্ঘমেয়াদে বৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে কৃষকদের হাতে সব রকমের আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটা নিতান্ত জরুরি। পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন থেকে শুরু করে ক্রেতার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপের মধ্যে সঠিক তালমেলে ঘাটতি থাকার দরুন উৎপাদন মার খায়। এদিকে জলবায়ু পরিবর্তন কৃষির উপর বেশ ভালোরকম প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে। যার মোকাবিলা করে খাদ্য সুরক্ষার লক্ষ্যপূরণের জন্য জমি ও জলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার পথে না হেঁটে উপায় নেই। এই সব সাত সতেরো সমস্যার

রেখাচিত্র-১
কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা খাতে সরকারের মোট ব্যয়

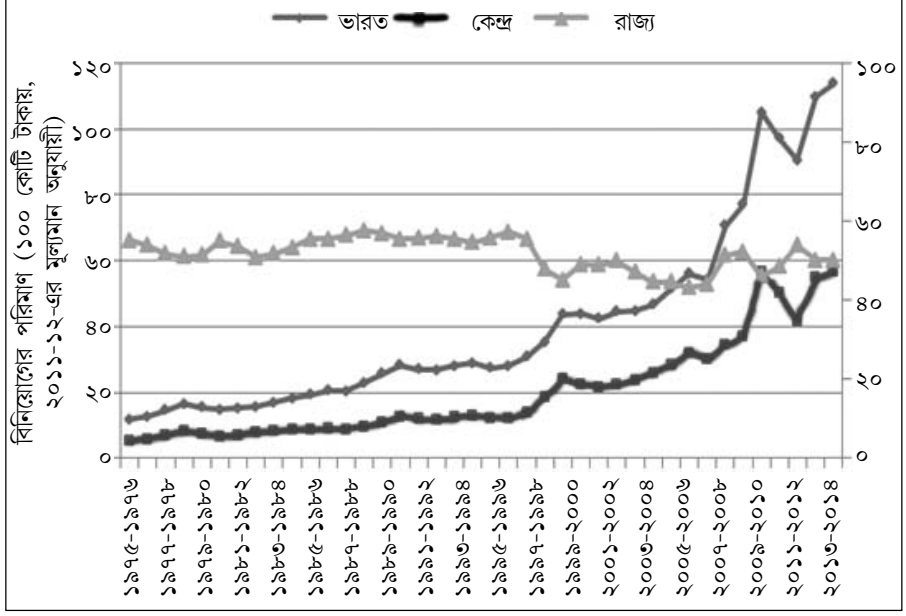

দীর্ঘমেয়াদি সমাধান এবং আগামীতে আরও যেসব চ্যালেঞ্জ আসতে চলেছে, তার মোকাবিলা এদেশের কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষি নীতির সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। আর্থ-সামাজিক কল্যাণের নিমিত্তে কৃষি প্রযুক্তির সুফলকে স্থায়ীভাবে কাজে লাগানোও জরুরি।

গবেষণা ব্যবস্থা ও গবেষণা খাতে বিনিয়োগ নিবিড়তা

● **দেশে কৃষি গবেষণা ব্যবস্থা :**

ভারতে কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এক ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থার আওতায়। শীর্ষস্তরে আছে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (Indian Council of Agricultural Research—ICAR); রাজ্যস্তরে আছে রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি; এবং তৃতীয় স্তরে বেসরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগে চালিত গবেষণা কর্মকাণ্ড। এছাড়াও, আছে কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগের কিছু প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (Council of Scientific and Industrial Research—CSIR), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক ইত্যাদি। গোটা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা একশোরও বেশি প্রতিষ্ঠানের এক সুবিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে ICAR-এর। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট পণ্য (Commodity) বা সম্পদ (Resource) বিষয়ে গবেষণা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান একাধিক পণ্য/সম্পদ নিয়েও কাজ করে। দেশে রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আজকের দিনে ৭০ ছাড়িয়েছে। ICAR-এর আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্র হল অখিল ভারতীয় সমন্বয়িত গবেষণা প্রকল্প (All India Coordinated Research Project—AICRP)। কৃষির বিভিন্ন শাখার মধ্যে এবং কৃষি গবেষণার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার নীতির উপর ভিত্তি করে এই সব সমন্বয়িত প্রকল্পের কাজ চালানো হয়। ১৯৫৭ সালে দেশে প্রথম AICRP-র সূচনা হয় ভুট্টার উপর। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দেখা যাচ্ছে, কৃষির বিভিন্ন শাখায় এবং বিবিধ কৃষিপণ্য সংক্রান্ত ৭৯-টি গবেষণা প্রকল্প (AICRP) চালাচ্ছে ICAR। যেমন—মৃত্তিকা, জল, শস্য, উদ্যানপালন (Horticulture), পশুসম্পদ, মৎস্যচাষ, কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিক্ষা ইত্যাদি। বিবিধ শস্যের ক্ষেত্রে এইসব সমন্বয়িত গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওয়ার সময়, যে অঞ্চলে প্রকল্প কর্মকাণ্ড চালানো হবে, সেখানকার বাস্তুতান্ত্রিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট শস্যকে নির্বাচন করা হয়েছে। ফলত, AICRP-গুলির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ এবং বিবিধ উপকরণের কার্যকরভাবে সদ্ব্যবহার হচ্ছে। পূর্ব নির্ধারিত অগ্রাধিকার এবং স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে সমন্বয় সাধন করে সমস্যার সমাধানের পথে হাঁটা হচ্ছে বলেই এই ধরনের সুফল মিলছে।

● **গবেষণা খাতে বিনিয়োগ :**

ভারতে কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা কর্মকাণ্ড প্রায় পুরোটাই চলে সরকারি ছত্রচ্ছায়ায়। কৃষি গবেষণা ও বিকাশ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। কৃষি-সহ বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় গবেষণা খাতে সরকার নিরন্তর অর্থের জোগান দিয়ে আসছে। কৃষি গবেষণা এবং শিক্ষা খাতে বিগত চল্লিশ বছরে (১৯৭৫-'৭৬ থেকে ২০১৩-'১৪) সরকারের মোট ব্যয়ের এক তুলনামূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে রেখাচিত্র-১-এর মাধ্যমে। দেখা যাচ্ছে, (২০১১-১২ অর্থ বছরের মূল্যমানের ভিত্তিতে) ১৯৭৫-৭৬ সালে সংশ্লিষ্ট খাতে সরকার ব্যয় করেছে ১,১৯০ কোটি টাকা; আর তার চল্লিশ বছর পর ২০১৩-১৪ সালে এসে এই ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১,৩৮০ কোটি টাকা; অর্থাৎ প্রায় দশ গুণ। বর্তমানে, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি, উভয় তরফেই কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা খাতে অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা বাড়ছে। তথ্য-পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গবেষণা ও শিক্ষা খাতে মোট ব্যয়ে রাজ্যগুলির অংশভাক ১৯৮৮-৮৯ সালে ছিল ৫৮ শতাংশ, যা ২০০৬-০৭ সালে অনেকটা কমে হয় ৪৩ শতাংশ। ২০১৪-১৫ সালে অবশ্য তা তুলনায় আবার অনেকটা বেড়ে ৫০ শতাংশে দাঁড়ায়। যাইহোক, সংশ্লিষ্ট খাতে কেন্দ্রীয় তহবিলের বেশ একটা বড়ো অংশই রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে হস্তান্তরিত করা হয় গবেষণা কর্মকাণ্ড বিকাশে মঞ্জুরি হিসাবে তথা অন্যান্য খাতে। স্থানীয় গবেষণা ও বিকাশ প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের কৃষি গবেষণা ও বিকাশ কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতা করতে তথা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে অপারগ। কেন্দ্রের উপর সব সময়ই অতিরিক্ত

সারণি-১
ধানের প্রজাতি উদ্ভাবনের খতিয়ান

ধানের প্রজাতির বৈশিষ্ট্যসমূহ	১৯৭১-১৯৮০	১৯৮১-১৯৯০	১৯৯১-২০০০	২০০১-২০১২
উদ্ভাবিত প্রজাতির মোট সংখ্যা	১২৭	২২৩	২৫৭	৩০১
সরু দানার জাতের সংখ্যা (শতাংশে)(ক)	২৯.১	৩৪.৯	৩৬.৫	২৮.১
রোগ-সংক্রমণ সহনীয় প্রজাতির সংখ্যা (শতাংশে)	৫০.৪	৬৭.২	৫১.০	৫২.৩
কীট/ফসল বিনষ্টকারী জীবের আক্রমণ সহনীয় প্রজাতির সংখ্যা (শতাংশে)	১০.২	২৫.১	২০.২	৩৩.১
অল্প পরিমাণ জমিতে চাষ তথা প্রতিকূল পরিবেশে বপনের জন্য উদ্ভাবিত জাতের সংখ্যা (শতাংশে)(খ)	৪১.৭	৫০.৬	৪৬.০	৩৩.৫
ফলনে কম সময় বা মাঝারি সময় লাগে এমন প্রজাতির সংখ্যা (শতাংশে)(গ)	৭৪.৮	৫৩.৮	৫২.৫	৭৯.২

সূত্র : Pal প্রমুখ (২০০৫) এবং http://drdpat.bih.nic.in/Downloads/Rice-Varieties—1996-2012.pdf
(ক) লম্বা ও সরু দানার জাত
(খ) বৃষ্টিসেবিত উঁচু জমি ও নিচু জমি, জলমগ্ন জমি, লবণাক্ত ও ক্ষারীয় বাস্তুতন্ত্র
(গ) ৫০ শতাংশ প্রজাতির ক্ষেত্রেই ১০০ দিনের কম সময়ে ধানের শীষ বের হয়ে যায়

তহবিল সংস্থানের জন্য বাড়তি চাপ থাকে। রাজ্যস্তরীয় ব্যবস্থার হয় এব্যাপারে কোনও মাথা ব্যথা নেই; অথবা অতিরিক্ত তহবিলের সংস্থানের জন্য নিজেদের কর্মকাণ্ডের খতিয়ান যথাযথভাবে পেশ করার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। তহবিল ঘাটতির এই ইস্যুটির দিকে নীতি প্রণেতাদের আশু মনোযোগ দেওয়া দরকার।

কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার জন্য সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের আরেকটি মাপকাঠি হল, গবেষণা বিনিয়োগ নিবিড়তা (Research investment intensity)। কৃষিক্ষেত্রের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (AgGDP)-এর সাপেক্ষে গবেষণা ব্যয়ের অনুপাতই হল 'গবেষণা বিনিয়োগ নিবিড়তা'। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এই অনুপাত ছিল ০.৫৭। তুলনায় ১৯৯০-এর দশকে তা ছিল ০.৪০। উন্নয়নশীল বিশ্বের মোটের উপর গড় ০.৬ শতাংশ গবেষণা বিনিয়োগ নিবিড়তার সঙ্গে তা তুলনীয় (Beintema এবং Stads, ২০১০)। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য কৃষি গবেষণা বিনিয়োগ নিবিড়তা সাধারণত ১.০ শতাংশ রাখার সুপারিশ করা হয়। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের ঘাটতি রয়েছে। যাইহোক, কৃষি গবেষণা ব্যবস্থার আয়তন এবং প্রকৃত ব্যয়, একের পর এক সামনে আসতে থাকা জটিল চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ ইত্যাদির খতিয়ান থেকে বলা যেতে পারে সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারি খরচে যুক্তিসংগত বৃদ্ধি ঘটতে চলেছে।

কৃষি গবেষণা ও বিকাশের অবদান

কৃষিক্ষেত্রের সামনে যেসব সমস্যা রয়েছে তার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান সম্ভব কৃষি গবেষণা ও বিকাশের মাধ্যমে। কৃষিক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ঘটেছে তার দৌলতে নতুন নতুন প্রযুক্তির বিকাশ/উদ্ভাবনে সাফল্য এসেছে। ফলত, উৎপাদনের একক প্রতি খরচ কমেছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই অবদান সবচেয়ে বেশি অর্থবহ। সরকারি বিনিয়োগে ফেরতলাভ/দাখিলার ঐতিহাসিক হার ৫০ শতাংশ ছাড়ায়। এই সমস্ত সাফল্যের অধিকাংশই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে শস্য এবং পশুসম্পদের ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায়। ফসল ওঠার আগের ও পরের পর্বের ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সৌজন্যে ফসলের অপচয় কমেছে; বেড়েছে ফসলের জোগান ও মূল্য সংযুক্তি (Alam প্রমুখ, ২০০২)। উৎপাদিত ফসলের অপচয় কমার দরুন তথা উৎপাদনে মূল্য সংযুক্তি ঘটায় সামগ্রিকভাবে জোগান বৃদ্ধির উপর সরাসরি অনুকূল প্রভাব পড়েছে। খরচ কমেছে উৎপাদনের; তথা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান বেড়েছে। শুধুমাত্র প্রযুক্তির প্রয়োগের দৌলতে কৃষির সমস্যাগুলির পুরোপুরি সমাধান করে ফেলা আদৌ সম্ভব নয়। তবে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কিছুটা অন্তত স্থায়ী সমাধান করা যেতে পারে। কাজেই, আজকের দিনে কৃষিক্ষেত্র যেসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, বিশেষ করে ভারতে, তার মোকাবিলার জন্য কৃষি গবেষণা ও বিকাশের ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

কৃষি গবেষণা বিকাশের অবদানের ছবিটা তুলে ধরার জন্য 'ধান'-এর বিবিধ প্রজাতির উদ্ভাবনের বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হল। কারণ, ভারতে এক মুখ্য শস্য হল ধান এবং অধিকাংশ প্রযুক্তিগত বিকাশই উদ্ভিদ প্রজাতিকে ঘিরে হয়েছে। সর্বোপরি, শস্য প্রজাতি হল এক অন্যতম বহুল ব্যবহৃত প্রযুক্তি এবং গবেষণা ও বিকাশের অবদান বোঝার জন্য কার্যকর সূচক তা। 'ধান' নিয়ে গবেষণা-সমীক্ষা বেশি হওয়ার কারণ, এই অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্যটি দেশের কৃষির আওতাভুক্ত এলাকার সিংহভাগ জুড়ে চাষ হয়; এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়ায় গবেষণা ব্যবস্থার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সারণি-১-এ পেশ করা তথ্য পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, এদেশে ধানের প্রজাতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সংখ্যার বিচারে ঊর্ধ্বগতির প্রবণতা বজায় রয়েছে বরাবর। গত শতকের সত্তরের দশক জুড়ে বাজারে এসেছিল ১২৭-টি ধানের প্রজাতি; আশির দশকে সংখ্যাটি পৌঁছায় ২২৩-এ। অর্থাৎ, ধানের প্রজননের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছিল প্রায়। নব্বইয়ের দশকে বাজারে ছাড়া ধানের প্রজাতির সংখ্যাটা বেড়ে হয় ২৫৭ এবং ২০০১-২০১২ এই সময়পর্বে আরও ৩০১-টি প্রজাতি ছাড়া হয়।

প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি, ধান প্রজনন কর্মসূচির দৌলতে সময়ের সাথে গুণমানগত কিছু পরিবর্তনও সাধিত হয়। উৎকৃষ্ট মানের (লম্বা ও সরু দানার) শস্যের প্রজাতির অংশভাগ ১৯৭০-এর দশকের ২৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৯০-এর দশকে দাঁড়ায় ৩৬ শতাংশে। তবে, ২০০১-২০১২

সারণি-২
ভারতে প্রধান প্রধান শস্যে কৃষি গবেষণার অবদান

বিশদ বিবরণ	ধান	গম	ছোলা	রেপসিড ও সরষে	তুলো
উৎপাদনের বৃদ্ধিতে TFP-র অংশভাক (শতাংশে)	২৪.৫	৫৮.৯	২৬.১	১০.১	৩১.৬
TFP বৃদ্ধিতে গবেষণার অংশভাক (শতাংশে)	৫৫.৭	৪০.১	৪২.২	৮৮.৬	৮৩.৬
উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষণার অবদান (শতাংশ পয়েন্ট)	০.৩২	০.৮৩	০.০৭	০.৪০	০.৮২
২০০৫-০৬-এ উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	১৩৩.৪৭	৭১.২৭	৫.৮	৭.৭২	১৯.১৯
উৎপাদনে গবেষণার অবদান (লক্ষ টন)	৪.২৩	৫.৯০	০.০৩৯	০.৩১	১.৫৮
মূল্য : ২০০৫-০৬ (টাকা/কুইন্ট্যাল)	৫৭০	১০৮০	১৪৩৫	১৭১৫	৩৫৭০
নির্দিষ্ট কিছু শস্যে গবেষণা অবদান (কোটি টাকায়)	২৪১.০	৬৩৬.৮	৫.৬	৫৩.২	৫৬২.৪

সূত্র : Chand প্রমুখ (২০১১)

সালের মধ্যে এই অংশভাগ ফের কমে দাঁড়ায় ২৪ শতাংশে; যদিও তার মধ্যে পুসা ১১২১ এবং পুসা ১৫০৯-এর মতো বাসমতী প্রজাতির অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রতিকূল জলবায়ু/পরিবেশে চাষের উপযোগী তথা জীবীয় পীড়ন (Biotic Stresses) সহনীয় প্রজাতির সংখ্যাধিক্য ঘটেছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। ধানের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এধরনের বিবিধ বৈশিষ্ট্যের বিকাশের সৌজন্যে ফলনের ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষণীয়ভাবে কমানো সম্ভব হয়েছে; এমনকী পূর্ব ভারতের বৃষ্টিসেবিত চাষ এলাকাতেও। ধানের সংকর প্রজাতি উদ্ভাবনের সৌজন্যে ফলনে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েছে। এভাবে উৎকৃষ্ট মানের দানা-সহ ধারাবাহিকভাবে উচ্চ ফলনহার ধান প্রজনন কর্মসূচির সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। সাধারণত যে সময় লাগে, তার তুলনায় অনেক কম বা মাঝারি সময়েই ফলন সম্পন্ন হয় এমন জাতের ধান উদ্ভাবনের উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮০-র এবং ১৯৯০-এর দশকে ধানের যেসব জাত কৃষিক্ষেত্রে ছাড়া হয় তার মধ্যে অর্ধেকই ছিল এধরনের। ২০০১-২০১২ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটি ৮০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে ব্যাপক তারতম্য, সেচের জলের জন্য খরচ বৃদ্ধি, প্রতি একক জমি থেকে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের জন্য একাধিক শস্য বা অর্থকরী ফসল চাষের ব্যাপারে কৃষকদের মধ্যে সচেতনার প্রসার হেতুই এই ধরনের প্রজাতির ব্যাপক হারে চাষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অন্যান্য শস্যের প্রজনন কর্মসূচির ক্ষেত্রেও একই ধরনের অগ্রগতি চোখে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে ভুট্টা এবং গমের কথা বলা যায়। ভুট্টার ক্ষেত্রে ফলন বাড়ানোর পাশাপাশি প্রচেষ্টা চালানো হয় এমন সংকর জাতের উদ্ভাবনের দিকে, যাতে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে, খাদ্য এবং পশুখাদ্যের বাড়তি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্য নিয়ে। গমের ক্ষেত্রে, এদেশে প্রায় ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে (১৯০৫-২০১০) সর্বমোট ৩৮১-টি প্রজাতির বিকাশ ঘটানো/উদ্ভাবন হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৬ জাতের গমের মধ্যে মরিচা রোগ প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য বর্তমান। পাশাপাশি, ২১৫-রও বেশি জাতের গমের মধ্যে আরও বেশ কিছু উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানো হয়েছে। যেমন—দানার পুষ্টিগুণ, গ্লুটেনিন নামক প্রোটিনের ভরপুর উপস্থিতি, পাস্তা তৈরির যাবতীয় গুণাগুণ ইত্যাদি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, স্বল্পমাত্রিক পুষ্টিপদার্থ (Micro-nutrient)-এ ভরপুর 'বায়ো-ফর্টিফায়েড' গমের প্রজাতি, কৃষিক্ষেত্রে ছাড়া হয়েছে। গরিব জনতার এক বড়ো অংশের শরীর স্বাস্থ্য সুস্থসবল রাখতে তা সহায়ক হবে।

পাশাপাশি, উদ্যানজাত ফসলের বিষয়ে গবেষণায়ও 'টিস্যু কালচার' ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রোগ সংক্রমণ মুক্ত প্রকৃতির উদ্ভিদ কোষকলার বিকাশ ঘটানো হয়েছে। যা থেকে অল্প সময়ে বহু সংখ্যক চারা তৈরি হচ্ছে। উন্নত মানের এইসব উচ্চ ফলনশীল জাত চাষিরা দ্রুত গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ প্রযুক্তিসমূহের প্রয়োগের দরুন ধান-গম চাষ ব্যবস্থায় ৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত জলের ব্যবহার কমেছে। পশুসম্পদ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিকাশের সূত্রে দুধ এবং মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গবাদিপশুর মৃত্যু হারও কমেছে।

অর্থনৈতিক সুফল

চাষের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে শস্যের ফলন বেড়েছে। ফলত, সম্ভব হচ্ছে বেশি পরিমাণে উৎপাদন। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ১৯৭৫ থেকে ২০০৫-এর মধ্যে

সারণি-৩
ভারতে গবেষণা বিনিয়োগ থেকে ফেরৎলাভের অভ্যন্তরীণ হার ও প্রান্তিক উৎপাদনের আনুমানিক খতিয়ান

শস্য	প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য, টাকায়	ফেরৎলাভের অভ্যন্তরীণ হার, শতাংশে
ধান	২.০২	২৯
গম	৪.০৩	৩৮
ভুট্টা	১.৮৫	২৮
জোয়ার	৪.২৮	৩৯
বাজরা	২.২৯	৩১
ছোলা	২.৮৪	৩৪
অড়হর ডাল	১২.৮২	৫৭
চিনেবাদাম	০.৭১	১৮
রেপসিড ও সরষে	০.৮৯	২০
তুলো	৪.১৫	৩৯

সূত্র : Chand প্রমুখ (২০১১)

শুধুমাত্র উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের দৌলতেই ৪.২৩ লক্ষ টন ধান এবং ৫.৯০ লক্ষ টন গমের অতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছে (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। মূলমানের বিচারে, এই অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ২৪১ কোটি এবং ৬৩৬.৮ কোটি। এই অতিরিক্ত ফলন শুধুমাত্র শস্যের সামগ্রিক উৎপাদনই বাড়ায়নি; দেশের একশো কোটিরও বেশি মানুষের খাদ্য সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করেছে; ধান, ভুট্টা, গম ইত্যাদি শস্যের ক্ষেত্রে একশো শতাংশ স্বয়ম্ভরতাও অর্জন করা গেছে। তবে তৈলবীজ এবং ডালশস্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে আমরা এখনও অনেকটা পিছিয়ে আছি। এদিকে আশু মনোযোগ দিয়ে জোরদার তৎপরতা চালানো দরকার।

উৎপাদন ব্যয় হ্রাস

অর্থনীতির ভাষায় 'Total Factor Productivity' (TFP)-র ধারণাটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় গবেষণার ভূমিকাকে সূচিত করতে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে বাস্তব সামগ্রী প্রয়োগ/ব্যবহার করা হয় TFP-অনুমান করতে তা হিসাবে আনা হয় না। যেসব প্রযুক্তিগত এবং জ্ঞানভিত্তিক ফ্যাক্টর কাজে লাগানোয় উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে, তার হিসাব করা হয়। সারণি-২ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৫ থেকে ২০০৫-এর মধ্যে অধিকাংশ শস্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষণা এবং জ্ঞানকে কাজে লাগানোয় ভালোরকম সুফল মিলেছে। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে গমচাষ এবং তারপর যথাক্রমে তুলো, ছোলা ও ধান। তথ্য-পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে আরও দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণা ও প্রযুক্তি প্রয়োগের দৌলতে যে বৃদ্ধি ঘটেছে, তা উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয় হ্রাস করতে সাহায্য করেছে। দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের দানাশস্য, ছোলা, তুলো এবং রেপসিড ও সরষের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ১.০ থেকে ২.৩ শতাংশ পর্যন্ত (২০০৫-০৬ অর্থ বছরের মূল্যমান)। এটা একদিকে যেমন গ্রাহকদের জন্য দানাশস্যের দাম কম রাখতে সাহায্য করেছে; অন্যদিকে তেমনি প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় কমায় উৎপাদক/চাষিদেরও উপকারে এসেছে। এভাবেই গবেষণাকর্ম

পুসা বাসমতী ১১২১ জাতের ধান

থেকে প্রাপ্ত প্রকৃত অর্থনৈতিক সুফল এই খাতে বিনিয়োগকে বহুগুণ ছড়িয়ে গেছে এবং সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারের আরও বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করেছে।

গবেষণা খাতে বিনিয়োগ ফেরৎলাভ

কৃষি গবেষণা খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে হয় সুফল পাওয়া যাবে, অথবা সুফল পাওয়া যাবে—এর অন্য কোনও বিকল্পই হতে পারে না। কারণ, কৃষিক্ষেত্রে TFP-তে সিংহভাগ অবদান রাখে গবেষণা কর্মকাণ্ড; যা কালক্রমে গ্রামীণ দারিদ্র্য কমাতে বিশেষ ভূমিকা নেয় (Chand প্রমুখ, ২০১১; Fan প্রমুখ, ১৯৯৯)। তথ্য-পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে কৃষি গবেষণা খাতে এক টাকা অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে গড়ে সমস্ত শস্যের ক্ষেত্রেই এক টাকার বেশিই সুফল মিলেছে ১৯৭৫ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে। ব্যতিক্রম শুরু চিনেবাদাম, রেপসিড এবং সরষে (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। গবেষণা বিনিয়োগে সবচেয়ে বেশি প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য (Marginal value product) পাওয়া গেছে অড়হর ডালের ক্ষেত্রে। এখানে গবেষণা খাতে অতিরিক্ত এক টাকা বিনিয়োগের সূত্রে অতিরিক্ত উৎপাদন মূল্য দাঁড়িয়েছে ১২.৮২ টাকা। অন্যান্য অধিকাংশ শস্যের ক্ষেত্রে গবেষণা বিনিয়োগ এক টাকা বাড়ালে অতিরিক্ত দুই থেকে চার টাকা পর্যন্ত সুফল মেলে।

গবেষণা খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনার বিষয়টি খতিয়ে দেখার আর একটি সূচক হল অভ্যন্তরীণ ফেরত লাভের হার (Internal rate of return—IRR)। এর থেকে প্রচ্ছন্ন মুনাফা সম্ভাবনা এবং বিনিয়োগের থেকে কত দ্রুত ফলপ্রাপ্তি সম্ভব, তার ধারণা পাওয়া যায়। সারণি-৩-এ তুলে ধরা তথ্য-পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতে কৃষি গবেষণা খাতে সরকারি বিনিয়োগে ১৯৭৫ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে সামগ্রিক IRR ঘটেছে ধানের জন্য ২৯ শতাংশ, গমের জন্য ৩৮ শতাংশ, ভুট্টার

জন্য ২৪ শতাংশ, অড়হর ডালের জন্য ৫৭ শতাংশ এবং তুলোর জন্য ৩৯ শতাংশ। সবুজ বিপ্লবের পর স্বল্প সময়পর্বের জন্য অন্যান্য সমীক্ষার মাধ্যমে যে সব অনুমান করা হয়েছিল, এই হার তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ফলাফল থেকে সুস্পষ্ট হচ্ছে, কৃষি গবেষণা খাতে আরও বিনিয়োগ করলে তাৎপর্যপূর্ণ ফেরৎলাভ সম্ভব, যা কালক্রমে দেশের কৃষিক্ষেত্রের বিকাশে অনুঘটক হিসাবে কাজ করবে।

গবেষণা সুফলকে ধরে রাখতে হবে

ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র এখন সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পূরণ করেছে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা এবং কর্মসূচি। প্রযুক্তির বিকাশ এবং তার যথাযথ প্রসার-প্রয়োগের মাধ্যমেই এই চমৎকার সম্ভব হয়েছে। অর্থনৈতিক সুফলের ছবিটা স্পষ্টতর হয়েছে অতীতের সঙ্গে তুলনায় এবং অন্যান্য সুফলের খতিয়ান পাওয়া গেছে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাস এবং পরিবেশগত সুস্থায়িত্বের বিস্তারের দৌলতে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্দেশ্য পূরণে কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাকে আরও বেশি কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার উপযোগী করে তুলতে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ফলনের ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়ার জন্য সীমিত সম্পদের ক্ষেত্রে নিয়মিত খুঁটিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষেত্রে/কর্মকাণ্ডে তা বরাদ্দ করা হচ্ছে। কৃষি গবেষণার খাতে তহবিলের জোগান ক্রমশ কমছে। এই সময়, গবেষণা কর্মকাণ্ড/প্রক্রিয়া সম্পর্কে আগ্রহ বজায় রাখতে এক কার্যকর উপায় হল অগ্রাধিকার নির্ণয়, নজরদারি এবং মূল্যায়ন (Prioritization, Monitoring and Evaluation—PME)। এই নতুন ব্যবস্থাপনা হাতিয়ার কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে গবেষণার সঠিক বিষয় নির্বাচন এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যে সম্পদ হাতে আছে তার যুক্তিযুক্ত বরাদ্দ-বন্টন করতে। বৃহৎ পরিসরে গবেষণা চালাতে গেলে তথা গবেষণার লক্ষ্য যদি বেশ জটিল হয়, সেই পরিস্থিতিতে এই বিশেষ ব্যবস্থাপনা হাতিয়ার বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বর্তমানে গবেষণা ব্যবস্থায় নিয়মিতভাবে PME অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে; গবেষণা কর্মের জটিলতাগুলি ভালো করে জেনে বুঝে নিতে তথা কৃষি প্রযুক্তি, গ্রামীণ জীবিকা নির্বাহ এবং জাতীয় বিকাশে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে। বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেই কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাকে চাহিদার সঙ্গে তাল মেলানোর আরও উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রাণ-পদার্থ বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী এবং গবেষণা অধিকর্তারা একযোগে কাজ করে চলেছেন। এবিষয়ে আর একটি বড়ো পদক্ষেপ হল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গবেষণা অংশীদারিত্ব। এর সঙ্গে প্রায়শই জুড়ে যায় বেসরকারি সংস্থা এবং কৃষিজীবীরাও। এধরনের অংশীদারিত্ব সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করে। চাহিদা নির্ভর প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে কার্যকর। পারস্পরিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ করে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে বাণিজ্যিক রূপ দেওয়ার জন্য। এবং এর সুফল ভাগ করে নেওয়া হয় মেধা সম্পদের অধিকারের ব্যবস্থাপনার জন্য গড়ে তোলা কাঠামো অনুযায়ী। এভাবেই, ভারতে কৃষিবিজ্ঞান অতীতে শুধু তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবদান রেখেই ক্ষান্ত হয়নি, ভবিষ্যতেও যাতে এই সুফল ধরে রাখা যায় সেজন্য বিবিধ কর্মসূচির রদবদল ঘটিয়েছে। যাইহোক, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা খাতে আরও বেশি বেশি করে সম্পদ বরাদ্দ করাটা জরুরি। একই সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষ এবং বিকাশ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগসূত্রকে আরও মসৃণ করে গড়ে তুলতে হবে প্রযুক্তির প্রসার ও প্রয়োগে গতি আনতে। ❑

সহায়ক সূত্র :

★ Alam, A., K. Gopakumar G. Kalloo (2002) *Report of the ICAR Sub-group on Post-harvest management under the aegis of ICAR.* Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

★ Beintema, N. and G. 1. Stads (2010) *Public agricultural R&D investments and capacities in developing countries: Recent evidence for 2000 and beyond.* Background Note for the Global Conference on Agricultural Research for Development, Montpellier, France, March 28-31.

★ Chand, R. P. Kumar and S.Kumar (2011) *Total factor productivity and contribution of research investment to agricultural growth in India,* Policy Paper 25, National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi.

★ Fan, S., P. Hazell and S. Thorat (1999) Linkage between government spending, growth and poverty in rural India. *Research Report 110,* IFPRl, Washington, D.C.

★ Ghosh, S. P. (1991) *Agro-climatic Zone-specific Research: Indian Perspective under NARP.* Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

★ ICAR (2016) */CARJDARE Annual Report 20j* 5-16. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

★ Jha, D. and S. Kumar (2006) *Research Resource Allocation in Indian Agriculture.* Policy Paper 23, National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi.

★ Pal, S., P. Mathur and A.K. Jha (2005) Impact of agricultural research in India: Is it decelerating'? *Policy Brief 22,* National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi.

(**লেখক পরিচিতি :** শ্রী কুমার ICAR-এর আওতাধীন 'National Institute of Agricultural Economics and Policy Research' নয়াদিল্লি-র অধিকর্তা। ইমেল : director.niap@icar.gov.in

শ্রী পাল ওই একই প্রতিষ্ঠানের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী।)

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ভারতে কৃষি বিকাশ

এই মুহূর্তে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৭ শতাংশ। এই বিপুল জনসমষ্টির খাদ্য চাহিদা মেটানো এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। তাই আজকের কৃষিকে একই সঙ্গে ভাবতে হচ্ছে এমন এক দীর্ঘস্থায়ী কৃষি বিকাশের কথা যা খাদ্য চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সুরক্ষিত রাখবে পরিবেশকে, সংরক্ষিত থাকবে প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞানের সচেতন ও সুকৌশল প্রয়োগ ব্যতীত যা অসম্ভব।—**ড. বঞ্জুল ভট্টাচার্য**

ভারত কৃষিনির্ভর দেশ। ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তিই হল কৃষি। বিশ্বব্যাংকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভারতের প্রায় ৬৮ শতাংশ মানুষ এখনও গ্রামে বাস করে, যাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের শ্রমজীবী মানুষের অর্ধেকেরও বেশি কৃষিনির্ভর। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পের চূড়ান্ত অগ্রগতির দিনেও ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো অনেকাংশেই কৃষির উপর নির্ভরশীল। ২০১৩-'১৪ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের ১৩.৭ শতাংশ ও বহির্বাণিজ্যের ১০ শতাংশ এসেছে কৃষি থেকে। যদিও তা ক্রমশ কমছে তবু অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় এই হার অনেকাংশে বেশি। এই মুহূর্তে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৭ শতাংশ। এই বিপুল জনসমষ্টির খাদ্য চাহিদা মেটানো এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। তাই আজকের কৃষিকে একই সঙ্গে ভাবতে হচ্ছে এমন এক দীর্ঘস্থায়ী কৃষি বিকাশের কথা যা খাদ্য চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সুরক্ষিত রাখবে পরিবেশকে, সংরক্ষিত থাকবে প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞানের সচেতন ও সুকৌশল প্রয়োগ ব্যতীত যা অসম্ভব।

কৃষি বিকাশের ইতিহাস

বর্তমান যুগ সর্বতোভাবেই বিজ্ঞানের যুগ। আধুনিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষ ও নিরন্তর জয়যাত্রার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অফুরন্ত অবদান। আর মানবসভ্যতার এই অগ্রগতির ইতিহাস রচনায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছে কৃষি বিকাশের ইতিহাস। মানব চরিত্রের দুর্নিবার অনুসন্ধিৎসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক মেলবন্ধনের ফসল আজকের এই পৃথিবী। কৃষিক্ষেত্রে এই অগ্রগতির সূচনা কিন্তু মানবসভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই। মোটামুটিভাবে নব্যপ্রস্তর যুগকেই কৃষির সূচনাকাল ধরা যায়। এই সময়েই পাথরের অস্ত্রগুলিকে উন্নততর করে মাটি কোপানো, ফসল কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হতে থাকে। এর আগে মানুষ বুনো, জংলি গাছপালা থেকে দানাশস্য খাওয়া শিখেছিল। এখন সেগুলিকে বেশি করে উৎপাদন করা ও মজুত করায় মন দিল। পশুপালনের জন্যও তাদের শস্য ও তৃণভূমির প্রয়োজন ছিল। তাম্রপ্রস্তর যুগে কৃষি উপযোগী যন্ত্রপাতি, বলদটানা গাড়ি ইত্যাদি কৃষিকে সমৃদ্ধ করে। উভয় যুগেই নানাবিধ ফসল বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় (রনধাওয়া, ১৯৮০)। এর মধ্যে ধান ও গম ছাড়াও যব, বিভিন্ন ডালশস্য ও খেজুর, আঙুর, বেদানা, ডুমুর জাতীয় ফল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাম্রপ্রস্তর যুগেই (আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত) সুমেরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটে যায়। এসবের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে কৃষিরও নানা উত্থান-পতন। তবে একথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক যুগেই কৃষিক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছে তার মূলে রয়েছে উন্নততর প্রযুক্তি ও নতুনতর কৌশলের প্রয়োগ। অন্যভাবে বলা যায়, কৃষির প্রয়োজন ও খাদ্যের চাহিদাই মানুষকে পথ দেখিয়েছে নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের।

ভারতবর্ষের কৃষি বিকাশের ধারাটিও একইভাবে প্রবাহিত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে ও দীর্ঘ গবেষণায় একথা জানা যায় যে, নব্যপ্রস্তর যুগেও ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষির প্রচলন ছিল। পাথরের তৈরি লাঙল ও কুঠার ব্যবহার করে, বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে অপেক্ষাকৃত নরম মাটি ও জলাজমিতে সেই যুগের মানুষ কৃষিকাজ করেছে। পরবর্তীকালে নদীমাতৃক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির ক্ষেত্রটিও অনেক প্রসারিত হয়। সিন্ধু সভ্যতার নানা নিদর্শনের মধ্যে বলদে টানা চাকার গাড়ি, বলদে টানা লাঙল, বীজ বপণের যন্ত্র, শস্য সংরক্ষণের জন্য গোলাঘর, বাঁধের মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি এক উন্নত কৃষি ব্যবস্থার সাক্ষ্য বহন করে। প্রধান কৃষিজাত ফসলের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির গম, যব, বার্লি, ছোলা, মটর, তিল, সর্ষে ও তুলোর সন্ধান পাওয়া যায়। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ও কৃষক সম্প্রদায়ের আবির্ভাবকাল হিসাবেও এই সময়কে সূচিত করা যায় (ইরফান হাবিব, ১৯৯৯)। আর্য সভ্যতায়, মগধ সাম্রাজ্যে, মৌর্যযুগে—সব সময়ই কৃষিকার্য বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা গুপ্ত সাম্রাজ্যে বাৎসায়ণ, বরাহমিহির প্রমুখের রচনা এর সাক্ষ্য বহন করে। এঁদের রচনায় মাটির প্রকারভেদ ও আবহাওয়ায় তারতম্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

থেকে শুরু করে বীজশোধন, জৈববস্তুর প্রয়োগে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির কথাও জানা যায়, যা বিজ্ঞান মনস্কতার দৃষ্টান্তস্বরূপ। বিভিন্ন প্রজাতির ধান, ডালশস্য, তৈলবীজ, নানাপ্রকার সবজি, আখ ও তুলা চাষের প্রসার ঘটে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন পার্বত্য এলাকায় নানা ধরনের ফলের গাছের কথা জানা যায়। সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যেও ভারতবর্ষে ফলচাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। মুগলযুগে বাদামের চাষ বিস্তারলাভ করে, যা থেকে পরবর্তীকালে ভোজ্য তেলের ব্যবহার শুরু হয়। আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে তামাক চাষের প্রচলন ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতে কলমের চারা তৈরির প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে ফলচাষে ব্যাপক উন্নতি ঘটে।

ব্রিটিশ ভারতে কৃষি উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করা। ইতোমধ্যেই ব্রিটেনে কৃষি ও শিল্প বিপ্লব ঘটে গেছে। সংকর জাতের উদ্ভিদের প্রজনন সম্ভব হয়েছে। এর কিছু কিছু প্রভাব ভারতবর্ষেও এসে পড়ে। এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চাও শুরু হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বিহারের পুসাতে Imperial Agriculture Research Institute ও পুণেতে কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। তারপর থেকে কৃষি গবেষণা এক অন্য মাত্রা পায়। যার সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় জমিতে। ইতোপূর্বেই স্থাপিত হয়েছে এগ্রি হর্ট সোসাইটি (১৮২০) ও বোটানিক্যাল গার্ডেন (১৭৮৭) কৃষি বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের পরিধিও বিস্তৃত হতে শুরু করে। কৃষি শিক্ষায় নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হতে থাকে। ফলস্বরূপ চাষের পদ্ধতি, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, উদ্ভিদের রোগতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, উদ্ভিদ জিনতত্ত্ব, সেচ ও জলসম্পদ ইত্যাদি নিয়ে চর্চা শুরু হয়। ফসলের উৎপাদন, পরিচর্যা ও সুরক্ষা নানা উন্নততর পন্থায় শুরু হয়।

গম উৎপাদনে ভারতের স্থান সারাবিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়।

স্বাধীন ভারতের কৃষিচিত্র

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষকে একাধিকবার ভয়াবহ খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই সময়ে জনসংখ্যার তুলনায় বার্ষিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের গড় বৃদ্ধি হার ছিল অনেক কম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করে। স্বাধীনতা অর্জনের পরও প্রায় দুই দশক ধরে খাদ্য সমস্যা বজায় ছিল যা মোকাবিলা করার জন্য বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির উপর নির্ভর করতে হ'ত। এই পরিস্থিতির মোকাবিলার লক্ষ্যে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু-র উদ্যোগে একাধিক কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গঠন ও কৃষিতে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কারের কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছিল। দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে সেই সময়ে উন্নত দেশগুলির পরামর্শ ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রযুক্তি ছিল অনেক বেশি উন্নত। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার ১৩ জন মার্কিন বিজ্ঞানীকে নিয়ে এক অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৬১ সালে দেশে চালু হয় নিবিড় জেলাভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (TADP) (স্বামীনাথন, ১৯৯০)। অধিক উৎপাদনেও সক্ষম জেলাগুলিকে চিহ্নিত করে কৃষককে যাবতীয় অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানই ছিল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প অত্যন্ত সার্থক হয়েছিল।

স্বাধীনতার সময়েই, ১৯৪৮ সালে দেশে ১৭-টি কৃষি মহাবিদ্যালয় ছিল। তৎকালীন ভারত সরকার একথা উপলব্ধি করে যে, কৃষি শিক্ষার প্রসার ও কৃষি বিজ্ঞানের চর্চা ভিন্ন দেশের কৃষির ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করা অসম্ভব। শুরু হয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রক্রিয়া। ১৯৬০ সালে প্রথম উত্তরপ্রদেশের পন্থনগরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্তমানে দেশে ৪২-টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং এগুলির অধীনে রয়েছে কৃষি মহাবিদ্যালয়। এগুলি ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদের (ICAR) দ্বারা পরিচালিত ও আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত। এছাড়াও ICAR-এর অধীনে ৫০-টি কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ১৭-টি জাতীয় গবেষণা কেন্দ্র এবং ৪১৫-টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সারা দেশব্যাপী রাজ্য, জেলা এমনকি ব্লক স্তরেও কৃষকদের বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

সবুজ বিপ্লব

দীর্ঘ গবেষণা ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিশ শতকের মাঝামাঝি আমেরিকান বিজ্ঞানী নরম্যান বোরলগের নেতৃত্বে মেক্সিকো সরকারের উদ্যোগে এক বিজ্ঞানীদল উচ্চফলনশীল উদ্ভিদ প্রজাতি তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবনে সক্ষম হল। এই প্রজাতি খর্বাকৃতি ও অপেক্ষাকৃত কম সময়ে মাটি থেকে অধিক খাদ্য ও জল গ্রহণ করে অধিক ফলনের উপযোগী। প্রথমে গমের জন্য এই প্রজাতি তৈরি হলেও শীঘ্রই ফিলিপিনসের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রে তাইচুং নেটিৎ-১ জাতকে ব্যবহার করে উচ্চফলনশীল IR-8 প্রজাতি উদ্ভাবন করা হয়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই ভারতেও এই উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারকে স্বাগত জানানো হয়। ১৯৬৫ সালে ভারতের তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর সুব্রাহ্মনিয়ামের উদ্যোগে ২৫০ টন উচ্চফলনশীল গমের বীজ বারতে আমদানি করা হয়। শীঘ্রই বিজ্ঞানী এম. এস. স্বামীনাথনের নেতৃত্বে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তৈরি করে ফেললেন এ দেশের পরিবেশের উপযোগী কল্যাণ সোনা, সোনালিকা ইত্যাদি একাধিক প্রজাতির গমের বীজ। জয়া, পদ্মা, রত্না ইত্যাদি উচ্চফলনশীল ধানের বীজও তৈরি হল। এরই পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্যশস্য যেমন, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদিরও উচ্চফলনশীল জাতের প্রচলন হয়। ফলত, খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। সারণি-১ লক্ষণীয়।

উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষি গবেষণার অভূতপূর্ব সাফল্যের হাত ধরে ভারতীয় কৃষিতে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির এই ব্যাপক সাফল্যই কৃষি ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব নামে অভিহিত হয়। সারণি-১ থেকে একথা স্পষ্ট যে, কৃষিজমির পরিমাণ সেভাবে বৃদ্ধি না পেলেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। আজ ভারত কৃষিতে শুধু স্বনির্ভরই নয়, কৃষিপণ্য রপ্তানিতেও যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। ধান ও গম এই দুই খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ভারতের স্থান সারাবিশ্বের মধ্যে যথাক্রমে দ্বিতীয়।

সারণি-১
স্বাধীন ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও সেচসেবিত এলাকা বৃদ্ধির তালিকা

বছর	কৃষিজমি (মিলিয়ন হেক্টর)	উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	সেচসেবিত এলাকা (মিলিয়ন হেক্টর)
১৯৫০-'৫১	৯৭.৩২	৫০.৮	১৭.৪৫
১৯৬০-'৬১	১১৫.৫৮	৮২.০০	২২.২১
১৯৭০-'৭১	১২৪.৩২	১০৮.৪	২৮.৮৪
১৯০৮-'৮১	১২৬.৬৭	১২৯.৬২	৩৬.১৭
১৯৯০-২৯১	১২৭.৮৪	১৭৬.০৮	৪৫.০৯
২০০০-'০১	১২১.০৫	১৯৬.৮০	৫২.২১
২০১০-'১১	১২৬.৬৭	২৪৪.৪৯	৬৩.২৬
২০১৩-'১৪	১২৫.০৪	২৬৫.০৪	১১৯.০৫

সূত্র : Agricultural Statistics at a glance 2014 (www.agricop.nic.in)

জলসেচ

উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভিদের চাষ ব্যাপক হারে প্রচলনের অন্যতম শর্তই হল প্রচুর জলের জোগান। আবার যেহেতু এই প্রজাতির উদ্ভিদ খুব অল্প সময়েই ফসল দেয় তাই একই বছরে একাধিকবার চাষের সুযোগও তৈরি হয়। তাই শুধুমাত্র বর্ষা ঋতুর উপর নির্ভর করে থাকা আর সম্ভব হল না। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দিকেই কিছু সেচ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। কারিগরি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বিরাট উত্তরণ চলছিল তারই প্রয়োগে একের পর এক জলপ্রকল্প নির্মিত হল। নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে একই সাথে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি কর সম্ভব হল। সারণি-১ থেকে একথা সহজেই বোঝা যায় যে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

একই সাথে কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, আগাছানাশক, রোগ দমনকারী ওষুধের ব্যবহার বৃদ্ধি পেল। কৃষি গবেষণায় নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হওয়ার ফলে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কৃষি উপকরণের প্রয়োগও বহুল প্রচলিত হয়ে উঠল। আরও একটি বিষয়ে সরকার তথা কৃষি বিজ্ঞানীদের সদর্থক মনোভাব ভারতীয় কৃষিকে অনেকাংশে সুরক্ষিত করে। এটি হল জাতীয় বীজ নিগম (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ) গঠন ও বীজ আইন প্রণয়ন। এর ফলে বিদেশ থেকে দূষিত বীজের অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশে ছেদ পড়ে। দেশীয় বীজের উপযুক্ত সংরক্ষণ ও নবীকরণের পরিকাঠামো রচিত হয়। বিভিন্ন শস্যের দেশজ প্রজাতিগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।

জৈবপ্রযুক্তি ও বর্তমান কৃষি

সারা বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রবল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একদিকে খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে, অন্যদিকে আজকের পৃথিবীর অন্যতম চাহিদা খাদ্যের প্রকৃত গুণমান বজায় রাখা ও পুষ্টিগত মান বৃদ্ধি করা। জিন ট্রান্সফার টেকনোলজি এ বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কৃষিবিজ্ঞানে জীব প্রযুক্তির ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলি হল—(i) জিন প্রযুক্তির প্রয়োগে জিনের পুনর্বিন্যাস এবং বহিরাগত জিনের প্রবেশ ঘটিয়ে নতুন প্রজাতির উদ্ভাবন, (ii) কোষ-কলা পালন (Tisue Culture)-এর সাহায্যে চারাগাছ তৈরি এবং (iii) বায়োফর্টিফিকেশন (Biofortification) বা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে শস্যের পুষ্টিগত মাত্রা বৃদ্ধি।

ভারতবর্ষে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে প্রথম কোষ-কলা পালন বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত হয়। যেসব উদ্ভিদের সহজে চারা হয় না এই পদ্ধতির সাহায্যে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে চাষের সুযোগ বাড়ানোর ফলে

এই পদ্ধতির জনপ্রিয়তা বাড়ে। আবার এই পদ্ধতির প্রয়োগে সংক্রামিত উদ্ভিদ থেকে রোগমুক্ত চারা উৎপাদনও সম্ভব হয়েছে। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক জাত তৈরির কাজেও এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হয়। উচ্চফলনশীল প্রজাতি সৃষ্টির সময় থেকেই উদ্ভিদবিজ্ঞানে সংকরায়ণ জনপ্রিয় ছিল। জিন প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে সংকরায়ণ সম্ভব নয় এমন যে কোনও উদ্ভিদের নির্দিষ্ট চরিত্র নির্ণয়কারী জিন অন্য যে কোনও উদ্ভিদে প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনা তৈরি হল। এইভাবে জিন ট্রান্সফারের মাধ্যমে তৈরি প্রজাতিগুলি ট্রান্সজেনিক বা জেনেটিক্যালি মডিফায়েড (GM) নামে পরিচিত। জীব প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ সম্ভব হলে উন্নত মানের ফসল; বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় সক্ষম সহনশীল প্রজাতি বা লবণাক্ত ও অম্লজমিতে চাষের উপযুক্ত প্রজাতি; নানাবিধ রোগ সংক্রমণ ও পোকামাকড়ের আক্রমণে সহনশীল প্রজাতি তৈরিও সম্ভব হবে। তবে, জি. এম. শস্যের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। বি.টি. ধান, জি.এম. টমেটো, বি.টি. বেগুন, বি.টি. তুলো প্রতিযোগিতায় কেউই সফল হয়নি। আন্তর্জাতিকস্তরেও জি.এম. প্রযুক্তি নিয়ে অনেক বিধি-নিষেধ রয়েছে।

পরিবেশের উপর প্রভাব

বিজ্ঞানের হাত ধরে সমগ্র কৃষিক্ষেত্রের এই চূড়ান্ত উত্তরণের দিনেও কতগুলি সমস্যা আজ সারা বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই সমস্যার প্রভাব আরও গভীর। পরিবেশের ভারসাম্য আজ বিঘ্নিত। আধুনিক কৃষির প্রয়োজনে বিগত চার-পাঁচ দশক ধরে কৃষিক্ষেত্রে অত্যধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের কারণে দূষিত হচ্ছে বায়ু, মাটি, জল। জমিতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় তার যতটুকু গাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তার অনেক বেশি অংশ মাটিতে মিশে যায়। সেই মাটি আবার নানাভাবে বাহিত হয়ে একদিকে যেমন ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের জল স্তরকে দূষিত করছে অন্যদিকে মাটির গভীরে প্রবেশ করে ভূ-গর্ভস্থ জলের দূষণ ঘটাচ্ছে। আবার সেচের জন্য যে অতিরিক্ত মাত্রায় ভূ-গর্ভস্থ জল ব্যবহৃত হচ্ছে তার ফলে ভূ-গর্ভের অ্যাকোয়াফারে এক শূন্যতা সৃষ্টি করে—যা আর্সেনিক তথা ধাতু দূষণের অন্যতম কারণ। ফলস্বরূপ যে শীতকালীন বোরোচাষ একদিন খাদ্য সমস্যা সমাধানে আশীর্বাদ বলে মনে হয়েছিল আজ তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। একই জমিতে বার বার চাষ করার ফলেও মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে, জমির জলধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, অম্লত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, মাটির জীবাণুঘটিত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কমছে উৎপাদনশীলতা।

জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে তার প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। প্রত্যেক উদ্ভিদেরই আবহাওয়াজনিত প্রয়োজন স্বতন্ত্র। বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা উর্দ্ধমুখী, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তনের উপর। অনিয়মিত বর্ষণ ও দীর্ঘস্থায়ী গ্রীষ্মের প্রভাবেও কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। কৃষি জমি থেকে মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড নামক দু'টি শক্তিশালী গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গত হয়, যার দূষণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। এসবই আগামী দিনের কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধিকে এক বড়ো প্রশ্ন চিহ্নের সামনে এনে দিয়েছে।

ভবিষ্যতের দিক্‌নির্দেশ

কৃষিই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণের একমাত্র মাধ্যম। তাই কৃষি বিষয়ক সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনও অত্যন্ত বেশি। আজকের বিশ্বকে সুরক্ষিত রেখে খাদ্য চাহিদা মেটানোর প্রক্রিয়াকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী জলের (Sustainable) কৃষি বিকাশ। তাই ভূ-গর্ভস্থ অপব্যবহার কমিয়ে, যথেচ্ছ রাসায়নিক ব্যবহার কমিয়ে আজকের বিজ্ঞান অগ্রাধিকার দিচ্ছে জৈব কৃষিকে (Organic farming)। গুরুত্ব পাচ্ছে জৈবসারের ব্যবহার, মাটি পরীক্ষা নির্ভর সার প্রয়োগ, বৃষ্টিপাত সংরক্ষণ, সঠিক ফসল চক্র নির্বাচন, অন্তবর্তী চাষের মাধ্যমে (Intercropping) জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন দূষণমুক্ত পদ্ধতি। সর্বোপরি এগুলি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন সার্বিক সচেতনতা। অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দায়বদ্ধ থেকে যাবে আজকের বিজ্ঞানচিন্তা।❑

উল্লেখপঞ্জি :

★ ইরফান হাবিব (১৯৯৯) ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ, মার্কসীয় চেতনার আলোকে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

★ Randhawa M. S. (1980) A History of Agriculture in India, Vol. I, ICAR, New Delhi.

★ Swaminathan, M. S. (1990) Jawaharlal Nehru and agriculture in independent India, Current Science, 59 : 6.

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক সহযোগী অধ্যাপক, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।)

পরিবেশ সুরক্ষা এবং সুস্থায়ী বিকাশ

হাত ধরতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির

*নিজেদের জন্য এক পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে আমরা সত্যি অপারগ। স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচিগুলি, শ্বাস নেওয়ার মতো নির্মল বাতাস, দেশের ঝরনা ও নদীগুলিতে নির্মল জলপ্রবাহ, জলে ও স্থলে সুস্থ বাস্তুতন্ত্র আজ বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে এক নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের নিষ্পত্তি করতে হবে। দেশ তথা গোটা বিশ্বের অধিবাসীদের প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকা চাহিদা এবং প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতি বিজ্ঞানের নিজের অগ্রগতির জন্যই শুধু নয়; এক সমৃদ্ধ প্রগতির জন্য, যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পরিবেশ সুরক্ষা এবং দীর্ঘস্থায়ী বিকাশ। লিখেছেন—*****সুদীপ্ত চ্যাটার্জি**

এমন একটা সময়ে এই নিবন্ধ লেখা হচ্ছে যখন উৎসবের আনন্দ মাটি হতে বসেছে দেশের রাজধানী শহরে বায়ুদূষণের জেরে। নয়াদিল্লিতে বাতাসের মান সম্ভবত এযাবৎকালীন সবচেয়ে খারাপ জায়গায় পৌঁছেছে। স্বপ্ননগরী এখন এক গ্যাস চেম্বার। উষ্ণতা কমেছে অস্বাভাবিক মাত্রায়। বদ্ধ বাতাস দূষণ সৃষ্টিকারী বিষাক্ত কণায় ভারাক্রান্ত। শরীরকে সুস্থসবল রাখার জন্য প্রাতঃভ্রমণের চলন বহুযুগ ধরে। দিল্লিবাসী অবশ্য তা ভুলতে বসেছে। এ সি চালিয়ে ঘরের মধ্যেই বসে থাকব আমরা। আশঙ্কার ছায়া ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। নিজেদের জন্য এক পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে আমরা সত্যি অপারগ। স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচিগুলি, শ্বাস নেওয়ার মতো নির্মল বাতাস, দেশের ঝরনা ও নদীগুলিতে নির্মল জলপ্রবাহ, জলে ও স্থলে সুস্থ বাস্তুতন্ত্র আজ বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে এক নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের নিষ্পত্তি করতে হবে। দেশ তথা গোটা বিশ্বের অধিবাসীদের প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকা চাহিদা এবং প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতি বিজ্ঞানের নিজের অগ্রগতির জন্যই শুধু নয়; এক সমৃদ্ধ প্রগতির জন্য, যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ পরিবেশ সুরক্ষা এবং দীর্ঘস্থায়ী বিকাশ। ড. আবদুল কালাম, শুধু দেশের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান নন, ছিলেন আমনাগরিকদের রাষ্ট্রপতি। ভারতের জন্য তিনি এক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা রচনা করেন—'ভিসন ২০২০'। দেশকে এক উন্নত জাতি হিসাবে তুলে ধরতে, তাঁর এই পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দিতে এগিয়ে আসে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সংস্থা TIFAC (Technology Information Forecasting and Assessment Council)। এই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে নতুন করে আর এক কর্মপরিকল্পনা 'ভিসন ২০৩৫'-এর রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। ঘোড়ার চালের সঙ্গে তুলনা করে 'ভিসন ২০৩৫'-এ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে 'প্লুতগতি' (Galloping), 'কদমগতি' (Cantering), 'ধীরগতি' (Trotting) এবং 'অতিধীরগতি' (Walking) এই চার শ্রেণিতে ফেলা হয়েছে। টেলি-যোগাযোগ, নিউক্লীয়, মিসাইল, জীববিজ্ঞান—এই ক্ষেত্রগুলিকে 'প্লুতগতি' শ্রেণিতে রাখা হয়েছে; 'পোলার' এবং 'জিওসিনক্রোনাস' উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে ভারতের সামর্থ্য, আবহাওয়া এবং জলবায়ুর পূর্বানুমান বিষয়ে এদেশের পারদর্শিতার কথা মাথায় রেখে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নিরিখে ভারতকে দেখা হচ্ছে কদমগতিতে চলা দেশ হিসাবে। কারণ ভারত রাসায়নিক পদার্থের নেট আমদানিকারক। খাদ্য এবং কৃষিক্ষেত্রে ভারত 'ধীরগতি' সম্পন্ন বলে ধরা হচ্ছে। কারণ, মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে অপচয় হওয়া সত্ত্বেও দেশের মোট রপ্তানিতে ১০.৩ শতাংশ অবদান রাখতে পেরেছে এই ক্ষেত্র। ভারত 'অতিধীরগতি'তে হাঁটছে অপর্যাপ্ত জলপথ এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিকাঠামোর নিরিখে; যা কিনা দেশের জনসংখ্যার জন্য অনিষ্টকর (টেকনোলজি ভিসন, ২০৩৫)।

এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এই সমস্ত 'কখনও শেষ হওয়ার নয়' সমস্যাগুলির থেকে পরিত্রাণ পেতে আমরা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির দিকেই তাকিয়ে থাকব। গ্রামীণ ভারতের জন্য পানযোগ্য জলের বন্দোবস্ত করা এবং শহরাঞ্চলে নির্বিচারে জলাশয় ধ্বংস; বাধাপ্রাপ্ত জল সম্পদের প্রবাহ নিতান্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দূষণের জন্য দায়ি গ্যাস-কণা ইত্যাদিকে উৎসেই পরিশোধনের ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে দেশের শহরগুলিতে নির্মল বাতাস জোগান, দু'দিক থেকেই আজ প্রশ্নের মুখে—না তো আমাদের সেই প্রযুক্তিগত সামর্থ্য আছে, না তো আমরা সংশ্লিষ্ট নীতিগুলি সার্থকভাবে রূপায়ণ করে উঠতে পারছি। 'ভিসন ২০৩৫' এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক গবেষণার আহ্বান জানিয়েছে। পরিচ্ছন্ন কয়লা ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি, বিকল্প জ্বালানি নির্ভর পরিবহন, 'অ্যাকুইফার' (aquifer) নামক ভূ-গর্ভস্থ জলসম্পৃক্ত প্রস্তর স্তরের উপর যথাযথ

নজরদারি, পানযোগ্য জলের তৎক্ষণাৎ গুণমান পরীক্ষা, পাইপলাইনের মধ্যেই স্বস্থানে জলের পরিশোধন। গবেষণার শেষোক্ত বিষয়টি এখনও কল্পনার স্তরেই রয়েছে। SARS (Severe acute respiratory Syndrom), বার্ড ফ্লু (H1N1), সোয়াইন ফ্লু ইত্যাদি রোগব্যাধি সম্পর্কেও আমরা এখনও কার্যত সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

শক্তিক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে এক হাজার গিগাওয়াট (GW) বিদ্যুৎ উৎপাদন। এর ৫০ শতাংশ নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসের মাধ্যমে। জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানো এবং দূষণ উদ্‌গিরণ মুক্ত শক্তি উৎপাদনের জন্য শক্তির বিকল্প উৎসকে পাখির চোখ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো দরকার। শ্যাওলা, নিউক্লীয় সংযোজন, থোরিয়ামের জন্য ফাস্টব্রিডার রি-অ্যাক্টর, জীবাশ্ম জ্বালানি নিষ্কাশনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, হাইড্রোজেন শক্তি, জৈব-শোধনাগার, ওয়্যারলেস বিদ্যুৎ প্রেরণ, সবুজ এবং নেট জিরো বিল্ডিং ইত্যাদি। জীবাশ্ম জ্বালানি নিষ্কাশনের অত্যাধুনিক কলাকৌশল, অনুজীবীয় জ্বালানি কোষ (microbial fuel cells) এবং শূন্য শক্তি কৃত্রিম আলো জ্বালানো (উদাহরণ, Bioluminence বা জৈবপ্রভা) এখনও পর্যন্ত বাস্তবের থেকে অনেক অনেক দূরে। আমাদের পরিবেশের জন্য সুরক্ষাকবচ দরকার। দূষণ সৃষ্টিকারী নির্মাণ সামগ্রী, যেমন—বালি ইত্যাদির বিকল্পের খোঁজ, নির্মাণ ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে অনুকরণ করে নক্‌শা প্রস্তুত করা (Bio-mimetic Constructions); বিশোষিত শক্তি ব্যবহার করে কৃত্রিম আলোর বন্দোবস্ত ইত্যাদির মাধ্যমে তা সম্ভব। সৌর শক্তির ক্ষেত্রে সিলিকন-এর ব্যবহার বন্ধ করে সে জায়গায় আনতে হবে জিঙ্ক অক্সাইড এবং বিভিন্ন জৈব পদার্থ। পারম্পরিক ধাতব আকরিক খনন এবং প্রক্রিয়াকরণের টেকনিকগুলিকে আরও বেশি পরিবেশ-বান্ধব করতে সচেষ্ট হতে হবে। পলিমার উৎপাদনের সময় দেখতে হবে তা থেকে যেন বিষক্রিয়া না হয় এবং পরিবেশে স্বাভাবিক/জৈবিক ভাবে বিনষ্ট হয়ে (Biodegradable) মিশে যায়। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমরা তখনও প্রায় অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। এক্ষেত্রে জৈবিক উপায় খুঁজে দেখতে আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হবে।

"জীব বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রজাতি বৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র বৈচিত্র্য ওবং জিনগত বৈচিত্র্য সবই পড়ে। জীব প্রজাতি বৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্র বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে কাজ চালিয়ে আসার দরুন আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি। কিন্তু জিনগত বৈচিত্র্য বিষয়ে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে এযাবৎ। এব্যাপারে তথ্য সংগ্রহে তৎপরতা বাড়াতে গবেষণাকর্মে জোর দিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে অরক্ষিত (অর্থাৎ, যাদের বিপদের সম্ভাবনা বেশি) জীব প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রগুলির উপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে—তা নিয়ে আমাদের খোঁজখবর চালানো দরকার। আনবিক জীববিজ্ঞান (Molecular biology) জীব প্রজাতির বিলুপ্তি ঠেকাতে (Deextinction) এক কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠতে চলেছে।"

শহরের পরিবেশ, শিল্প পরিবেশ, কৃষি পরিবেশ, গ্রিন হাইস গ্যাস (GHG) প্রশমন এবং বায়ুদূষণ তথা প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের দিক থেকে ২০২৫ সাল নাগাদ আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? এর ঠিক এক দশক পরে, ২০৩৫ সাল নাগাদই বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের হাতে কী ধরনের প্রযুক্তি থাকতে পারে? TIFAC সে সম্পর্কে 'ভিসন'-এর আকারে একটি সমীক্ষাপত্র প্রস্তুত করেছে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে। সারণি-১-এ এর সারাৎসার তুলে ধরা হল। বর্তমানে উল্লিখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের হাতে কী ধরনের প্রযুক্তি আছে; ২০২৫ এবং ২০৩৫ সাল নাগাদ আমাদের হাতে কী ধরনের প্রযুক্তি থাকতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে, তথা সেই লক্ষ্য পূরণে কী প্রচেষ্টা চালানো জরুরি এবং আগামী বাধাবিপত্তি নিয়ে বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে উল্লিখিত 'ভিসন'-এ। বিশ্বের ১৭-টি জৈববৈচিত্র্যে ভরপুর 'Megadiversity' দেশ-এর অন্যতম হল ভারত। বিশ্বের তিনটি জৈববৈচিত্র্য 'hotspots'-ই ভারতে অবস্থিত। এখানে রয়েছে বিশ্ব বন্যপ্রাণ তহবিল বা WWF (World Wildlife Fund)-এর তালিকাভুক্ত ৬-টি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত 'G200 Ecoregion'। গোটা বিশ্বে মোট যে আটটি 'Vavilovian Centre'-এর তালিকা রাশিয়ার জিনতত্ত্ববিদ্ এবং উদ্ভিদ প্রজননকারী N. I. Vavilov-এর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে অন্যতম নাম হল 'India' (হিন্দুস্তান)। প্রসঙ্গত শস্য-উদ্ভিদের আদি উৎপত্তিস্থলের ভিত্তিতে এই কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ভারতে রয়েছে বহু 'গুরুত্বপূর্ণ পক্ষী অঞ্চল' বা 'Important Bird Area' (IBA) এবং 'স্থানীয় পক্ষী অঞ্চল' বা 'Endemic Bird Area' (EBA)। ভারতে IUCN (International Union for Conservation and Nature)-এর আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে বৈজ্ঞানিক বনবিদ্যা (Scientific Forestry)-র অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই কেন্দ্র। তাসত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত মূলত সমৃদ্ধ উদ্ভিদবর্গ ও প্রাণীবর্গ (Flora and tauna)-এর কেবল তালিকা তৈরির উপরই জোর দিয়ে আসা হচ্ছিল। এখন এর অভিমুখ পরিবর্তন হয়ে এইসব জীবকূলের পরিসংখ্যানগত (population) বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা এবং বিভিন্ন জীব প্রজাতি কোথায় থাকতে পছন্দ করে বা কোথায় থাকতে পছন্দ করে না সেই সংক্রান্ত

সারণি-১

ক্ষেত্র	সমস্যা/ইস্যু	প্রযুক্তি পরিস্থিতি/প্রয়োজন	
		২০২৫ নাগাদ যে ধরনের প্রযুক্তি হাতে থাকতে পারে	**২০৩৫ নাগাদ যে ধরনের প্রযুক্তির নাগাল সম্ভব**
শহরের পরিবেশ	পৌর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	প্লাজমা প্রযুক্তি। সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, পরিবহণ এবং সন্নিবদ্ধ করার ব্যবস্থার যথাযথ নক্‌শা নির্মাণ। আরও কার্যকর জৈবিক প্রক্রিয়ার বিকাশ	উৎসেই বর্জ্য পদার্থের পরিশোধন ব্যবস্থাপত্র
	বৈদ্যুতিন বর্জ্য	মূল্যবান ধাতুর ব্যয়সাশ্রয়ী উদ্ধার	১০০ শতাংশ বর্জ্যের পুনঃব্যবহার প্রযুক্তি
	চিকিৎসা ক্ষেত্রের জৈব বর্জ্য	চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জৈব সরঞ্জাম-এর নতুন করে নক্‌শা তৈরি, যাতে তার পৃথকীকরণ এবং পুনঃব্যবহার সম্ভব হয়	
	সুস্থায়ী বিল্ডিং	'স্পেস কন্ডিশনিং' প্রযুক্তি। বিল্ডিং-এর নক্‌শা নির্মাণের জন্য সফট্‌ওয়্যার	মোবাইল বিল্ডিং-এর জন্য গবেষণা ও বিকাশ ঘটানো (মড্যুলার এবং পোর্টেবল কাঠামো প্রযুক্তি)
শিল্প পরিবেশ	শিল্প বর্জ্য জল	উভয়স্থলেই পরিশোধনের মাধ্যমে সম্পদ উপাদান হিসাবে ব্যবহারের জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতি	কোনও বর্জ্য উৎপন্ন হবে না, সবই রিসাইকেল করা হবে
	কঠিন শিল্প বর্জ্য	ইমোবিলাইজেশন টেকনোলজি (গড়িয়ে পড়া কঠিন বর্জ্যের জন্য জৈবিক এবং রাসায়নিক)	
	তেল দূষণ	জৈব এবং অজৈব উপাদানের জন্য ন্যানোমেটেরিয়ালের মাধ্যমে পরিশোধন	
কৃষি পরিবেশ	কৃষি বর্জ্য	ধানের কুঁড়ো এবং খড়ের মতো বর্জ্য ব্যবহার করা হয় এমন জৈবভর বয়লার/গ্যাসিফিকেশন-এর ক্ষেত্রে গবেষণা ও বিকাশ কর্মকাণ্ড। সেলুলজিক বায়োমাসকে তরল জ্বালানিতে পরিবর্তিত করতে বিভিন্ন উপায়।	
	খাদ্য/পানীয় জল শৃঙ্খলে দূষণ	কীটনাশক পদার্থের দ্রুত জৈবিক উপায়ে মাটিতে মিশে যাওয়া বিষয়ে গবেষণা। কীটনাশকের জীবনকাল হ্রাস, কীট এবং রোগ প্রতিরোধী জাতের শস্যের বিকাশ ঘটানো। কীটের জীবনচক্রে জৈবিক উপায়ে বাধা সৃষ্টি	মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শস্য/দানাশস্যের বিকাশ ঘটানো
গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো এবং বায়ুদূষণ	পরিচ্ছন্ন শক্তি প্রযুক্তি	বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য থোরিয়াম ব্যবহার। ফ্লোগ্যাস থেকে শ্যাওলা ব্যবহার করে কার্বন আবদ্ধ করা।	
	যানবাহন থেকে দূষণ	ওজনের অনুপাতে বেশি শক্তি উৎপাদন। দ্রুত রিচার্জ করা সম্ভব এবং দীর্ঘ আয়ুষ্কাল এমন সঞ্চারী ব্যাটারি।	
	চাষাবাদ পদ্ধতি	শুষ্ক এলাকার জন্য উচ্চফলনশীল জাতের ধানের চাষ	
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	জল সরক্ষণ		
	মৃত্তিকা সংরক্ষণ এবং পুনঃরুদ্ধার	সমস্যাযুক্ত মৃত্তিকা (অম্ল, ক্ষার এবং লবণযুক্ত)-তে চাষাবাদ প্রযুক্তি। উচ্চমাত্রার PH প্রতিরোধী শস্য প্রজাতির উদ্ভাবনা (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ)	
	বনপালন		
	জৈব বৈচিত্র্য এবং পারম্পরিক জ্ঞানের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার		

সূত্র : প্রযুক্তি ভিসন ২০৩৫ কর্মসূচি

'Species distribution modelling' (SDM) নিয়ে সমীক্ষা চালানোর উপর প্রভূত দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের বন্যপ্রাণ প্রজাতির মধ্যে কোনগুলির সংখ্যা কমতে কমতে IUCN-এর লাল-তালিকায় (Red-list) 'Critically Endangered' শ্রেণিভুক্ত (অর্থাৎ বিলুপ্তির দোর গোড়ায় পৌঁছে গেছে) হতে চলেছে—সে সম্পর্কে ধারণা থাকাটা জরুরি। একই রকম মনোযোগের দাবিদার নিম্নশ্রেণির জীব প্রজাতিগুলিও। যেমন—অমেরুদণ্ডী প্রাণীকূল বা জলে ভাসমান আণুবীক্ষণিক জীবকূল (Planktons)। এদের নিয়ে কমই নাড়াচাড়া করা হয়। কারণ, গোটা বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য এদের নেই। কিন্তু আমাদের জানতে হবে এইসব জীব প্রজাতির বৈচিত্র্য বিষয়ে; জল এবং স্থলের বাস্তুতন্ত্রগুলিতে তাদের ভূমিকা বা অবদান? সাম্প্রতিক অতীতে বাঘসুমারির পদ্ধতি নিয়ে বাকবিতণ্ডার জেরে বাঘের থাবার ছাপ গোনার সাবেক উপায় পরিত্যাগ করা হয়েছে। বদলে 'Occupancy Study'-র মতো নতুন মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে বাঘ গণনার ক্ষেত্রে। এই পদ্ধতিতে ক্যামেরা ফাঁদ এবং 'PRESENCE' ও 'MARK' সফটওয়্যার ব্যবহার করে বারংবার ছবি তোলা হয়ে থাকে।

জীব বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রজাতি বৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র বৈচিত্র্য ওবং জিনগত বৈচিত্র্য সবই পড়ে। জীব প্রজাতি বৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্র বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে কাজ চালিয়ে আসার দরুন আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি। কিন্তু জিনগত বৈচিত্র্য বিষয়ে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে এযাবৎ। এব্যাপারে তথ্য সংগ্রহে তৎপরতা বাড়াতে গবেষণাকর্মে জোর দিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে অরক্ষিত (অর্থাৎ, যাদের বিপদের সম্ভাবনা বেশি) জীব প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রগুলির উপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে—তা নিয়ে আমাদের খোঁজখবর চালানো দরকার। আনবিক জীববিজ্ঞান (Molecular biology) জীব প্রজাতির বিলুপ্তি ঠেকাতে (Deextinction) এক কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠতে চলেছে। এর সৌজন্যেই সরকার এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া 'চিতা'-কে ভারতের বনভূমিতে ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে। 'Forest Stewardship Council' এবং 'Marine Stewardship Council'-এর মতো আন্তর্জাতিক সদস্যপদ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্দেশিকাগুলি চালু করার মতো জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়িত করতে বিজ্ঞান অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। Elizabeth Kolbert তার 'The Sixth Extinction : An Unnatural History' (2014) বইটিতে উল্লেখ করেছেন, জীব প্রজাতির স্বাভাবিক বিলুপ্তি হারের তুলনায় হাজার গুণ দ্রুত হারে প্রজাতিগুলি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। তিনি একে 'Sixth Extinction'-এর যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

সুস্থায়ী বিকাশের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) পূরণের প্রভূত পরিমাণ দায়দায়িত্ব বর্তায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর। সহস্রাব্দ বিকাশ লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals)-র আওতাভুক্ত ক্ষেত্রগুলি ছিল দারিদ্র্য ও ক্ষুধার অবসান, সর্বজনীন শিক্ষা, লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য, পরিবেশগত সুস্থায়িত্ব এবং বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব। একে অনুসরণ করেই SDGs-এ জোর দেওয়া হয় জীবন ও জীবিকা, দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য সুরক্ষা, দীর্ঘমেয়াদে জল সুরক্ষা, বিশ্বজুড়ে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার, সবল ও উৎপাদনশীল বাস্তুতন্ত্র এবং সুস্থায়ী সমাজের জন্য প্রশাসন। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের সময়সীমা রাখা হয়েছে ২০৩০ সাল। আমরা এখন এমন একটা যুগে উপস্থিত হয়েছি, যাকে তকমা দেওয়া হয়েছে 'anthropocene'। এই সময়পর্বে পৃথিবীর কিছু মৌলিক প্রক্রিয়ার সৌজন্যে বিশ্বে এমন কিছু পরিবর্তন সাধিত হবে, যা স্থায়ী, অপরিবর্তনীয়। মানসভ্যতাকে তা মেনে নিয়েই মোকাবিলার রাস্তায় হাঁটতে হবে। এই সব পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিশ্বজুড়ে জল সংকট, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া, সমুদ্রের জলে অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্রের জলতল স্ফীতি এবং বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি-র মতো বিষয়গুলি। এইসব সমস্যার সমাধান

শিশুদের বিজ্ঞান কংগ্রেস, ২০১৭ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা

বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। Griggs (২০১৩) ও আরও অনেকে জোর দিয়ে বলেছেন, যদি আমরা উপরোক্ত সুস্থায়ী বিকাশের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারি তবে পৃথিবীর স্থায়িত্ব, সুনিশ্চিত করাও সম্ভব হবে। 'Stockholm Environment Institute'-এ গবেষণা চালিয়ে Rockstrom (২০০৯) বিশ্বে এই পরিবর্তনের সর্বোচ্চ সীমা চিহ্নিত করেছেন। তার মতে, পৃথিবীর আবহমণ্ডলে কার্বনডাই-অক্সাইডের ঘনত্বের মাত্রা ৪০০ PPm-এ পৌঁছালে জলবায়ু পরিবর্তন, জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং নাইট্রোজেনের সঞ্চয় সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

পরিবেশ সুরক্ষার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক মহল বেশ কিছু অঙ্গীকার রক্ষা করতে দায়বদ্ধ। ভারতের ওপরও এরকম কয়েকটি অঙ্গীকার রক্ষার দায় বর্তায়। এজন্য প্রভূত পরিমাণে বিজ্ঞান ভিত্তিক পন্থাপদ্ধতিকে কাজে না লাগিয়ে উপায়ান্তর নেই। INDC (Intended Nationally Determined Contribution) নামক ভারতের তরফে একটি লক্ষ্যমাত্রা দাখিল করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ ৩৩-৩৫ শতাংশ পর্যন্ত কমানো হবে। পাশাপাশি, ওই সময়ের মধ্যেই

UNFCCC (United Nations Framework for Combating Climate Change) অনুযায়ী, বনভূমি আচ্ছাদিত এলাকার আয়তন বাড়িয়ে অতিরিক্ত আরও ২.৫-৩ বিলিয়ন টন পর্যন্ত কার্বনডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমানো হবে।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পালনেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন—জৈবিক বৈচিত্র্য সংক্রান্ত চুক্তি (Convention on Biological Diversity—CBD), আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ জলাভূমিগুলির সংরক্ষণ বিষয়ক রামসর চুক্তি, মরুস্থলের প্রসারণ প্রতিরোধে রাষ্ট্রসংঘের চুক্তি (United Nations Convention on Combating Desertification—UNCCD), পরিযায়ী প্রজাতিগুলি সংক্রান্ত চুক্তি (Convention on Migratory Species—CMS), রাষ্ট্রসংঘের সমুদ্র সংক্রান্ত বিধি ইত্যাদি।

শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান TERI গত ২০০১ সাল থেকে রাজধানীতে সুস্থায়ী বিকাশ শীর্ষসম্মেলন (Delhi Sustainable Development Summit) আয়োজন করে আসছে। চলতি বছরের অক্টোবরে বিশ্ব সুস্থায়ী বিকাশ শীর্ষসম্মেলন (World Sustainable Development Summit)-এর আয়োজন করা হয়েছিল দিল্লিতেই। সম্মেলনে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি, প্রণব মুখোপাধ্যায় আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের আমরা ন্যাসরক্ষক মাত্র, এসব সম্পদেরই অপচয় করার কোনও অধিকার আমাদের নেই। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভাগ (DST) প্রতি দু'বছর অন্তর জাতীয় স্তরে শিশুদের জন্য বিজ্ঞান কংগ্রেস (National Children's Science Congress—NCSC) আয়োজন করে থাকে। আগামী ২০১৭ সালে এই বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল ভাবনা (theme) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে 'সুস্থায়ী বিকাশের জন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনা' (Science, Technology and Innovation for Sustainable Development)। দশ থেকে

বিশ্ব সুস্থায়ী বিকাশ শীর্ষসম্মেলন, ২০১৬

সতেরো বছর বয়সী শিশু/কিশোর-কিশোরীরা এই বিজ্ঞান কংগ্রেসে সুস্থায়ী বিকাশ সম্পর্কে তাদের ধ্যানধারণা তুলে ধরার সুযোগ পাবে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও কৃষি, শক্তি, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান এবং পুষ্টি, জীবনশৈলী এবং জীবিকানির্বাহ, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা এবং পারম্পরিক জ্ঞান ব্যবস্থার মতো ক্ষেত্রগুলিতে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সূত্রে যেমন অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব, তেমনি এর কিছু কুফলও আসে সেই সূত্রেই; এ দু'টিকে গুলিয়ে ফেলেল চলবে না। জিন থেরাপি এবং জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব (Genetically Modified Organism—GMO)-এর ব্যবহার সম্পর্কে গোটা বিশ্বজুড়েই আশঙ্কার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। এই ইস্যুটির দিকে নজর দেওয়া দরকার। GMO ফসল চাষ শুরু হওয়ার পর ভারতীয় কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়াটা এই প্রসঙ্গে মাথায় রাখা উচিত। নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আগে দরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং মডেলগুলি নিয়ে সমীক্ষা চালানো। বিজ্ঞান আমাদের সামনে সব সময়ই এই সুযোগ খোলা রাখে। 'Current Science' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে ধারাবাহিকভাবে কাঁটাছেঁড়া করে দেখানো হয়েছে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ব্যহত হওয়ার পেছনে কোন কোন ফ্যাক্টর অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে। এখন বিজ্ঞান/প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে মানবসম্পদ রয়েছে, তার সঙ্গে গবেষণা ও বিকাশ খাতে নূন্যতম বিনিয়োগকে কোনও মতেই মেলানো যায় না। কারণ উল্লিখিত খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের এক শতাংশ মাত্র। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অধিকাংশই আমলাতন্ত্রের গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছেন। ফলত, উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আমাদের অক্ষমতার পারদ ক্রমশ চড়ছে। আর (গবেষণা) চৌর্যবৃত্তির বিষয়ে তো খোলাখুলি আলোচনা হয়। যাই হোক এখন আমাদের খাপছাড়াভাবে প্রযুক্তি নির্ভরতা, প্রযুক্তি আমদানি এবং প্রযুক্তি গ্রহণের পথ ত্যাগ করে প্রযুক্তির উপর আস্থাশীল হওয়ার সময় এসেছে। এজন্য জরুরি হয়ে পড়েছে, আমরা বর্তমানে যে প্রযুক্তির সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তার গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ তথা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতা এবং সামর্থ্য বৃদ্ধির। দেশে মৌলিক গবেষণার বৃদ্ধি ১৪৬ শতাংশ ছাড়িয়েছে—একে যথাযথ বাণিজ্যিক উদ্যোগের রূপ দিতে হবে। এখানে আর নতুন করে বলার দরকার নেই যে, আমাদের দেশের উচ্চস্তরীয় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদ্যোগী হয়ে বৈজ্ঞানিকদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার রাস্তা খুঁজে বের করতে পারেন।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক TERI বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক। ইমেল : s.chatterjee@teriuniversity.ac.in)

আকাশছোঁয়া সাফল্যের অংশীদার হতে পারো তোমরাও

WBCS -2015 Gr A/B : মোট সফল ৩০ জনেরও অধিক

SOUVIK GHOSH
Exe., (Rank 1) 2015

SUPRATEEM ACHARYA
Exe., 2015

Nikhat Parwez
Co- opt., Service (Gr A) 2015

Md. Jawed
ADSR, (Gr A) 2015

Mihir Karmakar
Exe., 2015

Abhishek Basu
Exe. (Rank-4) 2014
Co- opt., Service (Gr A) 2015

WBCS - 2015 এর গ্রুপ A এবং B তে সফল ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হল কলেজ স্কোয়ারে গত ১৬ই অক্টোবর, ২০১৬। ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দিলেন অবসরপ্রাপ্ত আইএস অফিসার মাননীয় নুরুল হক মহাশয়

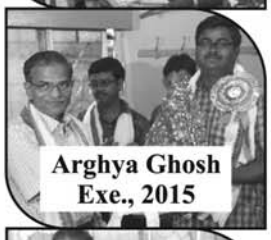
Arghya Ghosh
Exe., 2015

Saugata Chowdhury
Exe., 2015

Humayun Chowdhury
Exe., 2015

Junaid Amir
CTO, 2015

MD. Ali Raza
DSP, 2015

Habibur Rahaman
Excise Service, 2015

গত ৫ই অক্টোবর ডব্লুবিসিএস ২০১৫ –এর চূড়ান্তফল প্রকাশিত হল। চূড়ান্তসাফল্যের নিরিখে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন আবার ৯ নম্বর। মোট সফল ৩০ জনেরও অধিক। শুধু চূড়ান্ত উত্তীর্ণের সংখ্যার বিচারেই নয় অ্যাকাডেমিক এখন র‍্যাঙ্কিংয়েও প্রথম।

সাফল্যের জন্য দরকার পরিশ্রম যাকে ইংরাজিতে বলা হয় Hard Work। কিন্তু বর্তমান প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ের যুগে শুধুমাত্র Hard Work সাফল্য এনে দিতে পারবে না, তার জন্য দরকার Smart Work। অর্থাৎ তোমার বইপত্র চয়ন, গেমপ্ল্যান, স্ট্র্যাটেজি থেকে শুরু করে প্রস্তুতি এবং পরীক্ষা দেওয়া — প্রতিটি পর্যায়ই করতে হবে অত্যন্ত কুশলীভাবে, স্মার্টলি। হার্ডওয়ার্ক নিজে নিজে করে নেওয়া যায়, কিন্তু কোয়ালিটি ওয়ার্ক এবং স্মার্ট ওয়ার্কের জন্য একজন সুদক্ষ গাইডের প্রয়োজন— যিনি নিজে হবেন স্মার্ট এবং যার থাকবে যথেষ্ট কোয়ালিটি। এরকম স্মার্ট গাইডের সাহায্য এবং সহচর্য পাওয়া সম্ভব একমাত্র অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনেই। তাইতো এখানে যোগদান করে অতি অল্প সময়েই আসছে সাফল্য। সাফল্যের শতকরা হারে এই প্রতিষ্ঠান এখন সবার সেরা। তাই লক্ষ্য যদি হয় সিভিল সার্ভিস, তবে একমাত্র গন্তব্য হোক অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।

WBCS-2017 প্রিলি ও মেনসের নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে।

প্রকাশিত হল অ্যাকাডেমিক টেস্ট সিরিজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইয়ারবুক - ২০১৭

সামিম সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে চলেছে ডব্লুবিসিএস প্রিলি পরীক্ষার একমাত্র কমন যোগ্য মকটেস্টের বই।

✆ ফোন : 7031842001 প্রচুর প্রশ্ন কমনের সম্ভাবনা

WBCS - 2017
POSTAL COURSE

প্রিলি ও মেনসের জন্য পোস্টাল কোর্স চালু আছে। পোস্টাল কোর্সে রয়েছে— • প্রিলি এবং মেনসের ১০০% কমনযোগ্য নোটস্। • ১৫০টিরও বেশি ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট। • ডব্লুবিসিএস অফিসার দ্বারা ইন্টারভিউয়ের জন্য বিশেষ গ্রুমিং সেশন। • নির্বাচিত কিছু ক্লাস। • প্রিলি এবং মেনস্-এর জন্য স্ট্র্যাটেজি এবং নেগেটিভ কন্ট্রোলের বিশেষ ক্লাস।

থাকছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর বিশদ আলোচনা ঃ

• প্রস্তুতির তিন দশা • সাফল্যের পূর্বশর্ত—ফোকাস, আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য্য, অ্যাটিটিউড • কি চাইছে ডব্লুবিসিএস • কি পড়তে হবে না • ডব্লুবিসিএস কেন সহজ • টার্গেট স্কোর • কাট অফ মার্কস • ওএমআর শীট পূরণ।

Academic Association

H.O. : The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

✆ 9038786000
✆ 9674478644

Website : www.academicassociation.in ■ Centre: Uluberia-9051392240 ✹ Barasat-9800946498 ✹ Berhampur-9474582569 ✹ Birati-9674447451 ✹ Medinipur-9474736230 ✹ Darjeeling-9832041123 ✹ Siliguri-9474764635

মহাকাশ এবং মানবসমাজ

*উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারত তার মহাকাশ (গবেষণা) কর্মসূচি শুরুই করে প্রায় বিশ বছর পরে। অথচ আজ মহাকাশে পাড়ি জমানো ছয়টি অগ্রণী রাষ্ট্রের সাথে এক সারিতে উঠে এসেছে। কিন্তু ভারত হল বিশ্বের একমেবাদ্বিতীয়ম্ দেশ, যারা অসামরিক লক্ষ্য নিয়ে মহাকাশ কর্মসূচির বিকাশের রাস্তায় হেঁটেছে। ভারতে মহাকাশ গবেষণা কর্মসূচির জনক হিসাবে পরিচিত দূরদ্রষ্টা বৈজ্ঞানিক ড. বিক্রম সারাভাই কেবল মহাকাশ প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে অনুভব করেই থেমে থাকেননি; সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহার করা সম্ভব, তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রসার ঘটেছে সে রাস্তাতেও। সেই পথই এযাবৎ অনুসরণ করে আসছে ISRO তথা ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কর্মসূচি। লিখেছেন—*****জি. মাধবন নায়ার**

উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারত তার মহাকাশ (গবেষণা) কর্মসূচি শুরুই করে প্রায় বিশ বছর পরে। অথচ আজ মহাকাশে পাড়ি জমানো ছয়টি অগ্রণী রাষ্ট্রের সাথে এক সারিতে উঠে এসেছে। বিদেশি রাষ্ট্রের খুব বেশি সাহায্য ছাড়াই মহাকাশ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। দড় হয়ে উঠেছে এই প্রযুক্তি ব্যবহারে। তৈরি করেছে শক্তিশালী রকেট। ভূ-প্রেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি ও নির্দিষ্ট কক্ষপথে তা স্থাপন করেছে। মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে এই ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত বিকাশ ভারত সম্ভব করেছে এ দেশের মাটিতেই, দেশের বৈজ্ঞানিকদের হাতেই। এবং তা ধারে-ভারে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম।

শক্তিশালী রকেট ব্যবহার করে পৃথিবীর কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের দৌলতে মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে বিপ্লব আসে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে আবহমণ্ডলের উপস্থিতি বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু রকেটের সাহায্যে শক্তিশালী যন্ত্রপাতি আবহমণ্ডলের পরিধির বাইরে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। ফলত, মহাজাগতিক বস্তুসমূহের সুস্পষ্ট চিত্র আমরা পেয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে যে মহাকাশযান চক্কর কাটছে, তা এই মহাবিশ্বকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার এক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজে আসছে। একই সাথে আমরা পাচ্ছি আমাদের গ্রহ পৃথিবীর খুঁটিনাটি দৃশ্যচিত্রও। কাজেই, এই মহাকাশ প্ল্যাটফর্মগুলি এখন মহাবিশ্ব সম্পর্কে তার মৌলিক জ্ঞানভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করতে মানবসভ্যতার কাছে এক শক্তিশালী হাতিয়ার। একই সাথে, তা পৃথিবী পৃষ্ঠে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্য পূরণে পরিষেবা জোগানোকে সহজ করে তুলেছে।

রকেট তৈরির ইতিহাস খুঁজতে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ষষ্ঠ শতকে। আতশবাজি হিসাবে চিন দেশীয় মানুষ এমন একটি বস্তু তৈরি করে, যাকে আমরা রকেটের এক্কেবারে আদিরূপ বলে ধরে নিতে পারি। পরবর্তীকালে, ভারতে টিপু সুলতান ১৭৮২ সাল নাগাদ ব্রিটিশ সেনার সঙ্গে লড়াইয়ের সময় শ্রীরঙ্গপত্তনম-এ 'রকেট' ব্যবহার করেন যুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবে। এর পরের গল্পটা শুরু হয় ইউরোপে। বিশ শতকের প্রথম দিকে অনেক বেশি পেশাদারিত্বের সঙ্গে রকেট বিজ্ঞানের বিকাশে হাত পাকায় রাশিয়া এবং আমেরিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Oberth এবং সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় Tsiolkovsky রকেটের ইঞ্জিন এবং জ্বালানির (Propellants) বৈজ্ঞানিক সূত্রের ব্যাখ্যা করেন।

যুদ্ধ হাতিয়ারের চাহিদার দৌলতেই রকেট ব্যবস্থার উন্নয়নে জোরদার তৎপরতা শুরু হয়। এবং একটা স্তর পর্যন্ত তা পূর্ণতা পায়। জার্মানরা যে V2 রকেট তৈরি করে, তা মিত্রশক্তির কাছে ছিল দুঃস্বপ্ন বিশেষ। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে জার্মানির এই সব রকেট প্রযুক্তিবিদদের একাংশকে আমেরিকা দলে ভিড়িয়ে নেয়; অন্যরা চলে যান সোভিয়েত রাশিয়ার শিবিরে। সামরিক একাধিপত্যের লক্ষ্যে তৎকালীন বিশ্বের এই দুই 'সুপার পাওয়ার'-এর মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, তার প্রভাব পড়ে রকেট ব্যবস্থার উন্নয়নের উপরও। মিসাইল ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে বহু শক্তিশালী রকেট তৈরি হয়। মানুষের হাতে তৈরি কোনও বস্তু যে কৃত্রিম উপগ্রহ হিসাবে পৃথিবীর চারপাশের কক্ষপথে স্থাপন করা যায় তা বিশ্ববাসী প্রথম প্রত্যক্ষ করে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার সৌজন্যে। ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর 'স্পুটনিক' মাধ্যাকর্ষণের লক্ষণরেখা পেরোয়। পিছিয়ে থাকেনি আমেরিকাও। এর পর পরই তারা মহাকাশে পাঠায় 'জেমিনি' ক্যাপসুল। পৃথিবীর কাছেপিঠে মহাকাশ অঞ্চলে মানুষের এই সব অভিযান এবং তারপর চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম অবতরণ ছিল মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে বড়োসড়ো পদক্ষেপ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে মিসাইল ব্যবস্থা আরও উন্নত মানের করে তোলার গবেষণার এবার অভিমুখ বদলে যায়। ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে পৃথিবীর কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন অথবা সৌরজগতের দূরতম অঞ্চলে মহকাশযান প্রেরণ। মহাজাগতিক দুনিয়াকে আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখার জন্য শক্তিশালী

হাতিয়ার হয়ে ওঠে এই সব কৃত্রিম উপগ্রহবাহিত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। খুব তাড়াতাড়ি একই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইউরোপ এবং চিনও। আমেরিকার সহযোগিতায় এর পর জাপানও মহাকাশ কর্মসূচির বিকাশে মনোনিবেশ করে।

পক্ষান্তরে, ভারত হল বিশ্বের একমেবাদ্বিতীয়ম্ দেশ, যারা অসামরিক লক্ষ্য নিয়ে (Civilian domain) মহাকাশ কর্মসূচির বিকাশের রাস্তায় হেঁটেছে। দূরদ্রষ্টা বৈজ্ঞানিক ড. বিক্রম সারাভাই কেবল মহাকাশ প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে অনুভব করেই থেমে থাকেননি; সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহার করা সম্ভব, তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রসার ঘটেছে সে রাস্তাতেও। ষাটের দশকের শেষের দিকে ড. সারাভাই, এ দেশের মহাকাশ কর্মসূচির এক ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রস্তুত করেন, যা পরবর্তীকালে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Indian Space Research Organisation, ISRO)-র 'বাইবেল' হয়ে ওঠে। ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির সূচনা হয় ১৯৬৩ সালে থুম্বা সৈকত থেকে একটি রকেট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে। এই রকেট একটি 'Payload' (অর্থাৎ, কোনও স্যাটেলাইটের রকেট তার যাত্রাপথের জন্য প্রয়োজনীয় যে সামগ্রী বহন করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে পড়ছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও; যেমন—স্যাটেলাইটের ক্যামেরা ইত্যাদি) বহন করে নিয়ে যায়, আবহমণ্ডলের উপরের দিকের স্তরের এবং আয়নমণ্ডলের (Ionosphere) বায়ুর গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য। সেখান থেকে আজ আমরা অনেক অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি। ড. সারাভাই মহাকাশ অভিযানের জন্য রকেট তৈরিতে অগ্রগতি এবং থুম্বায় মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কেন্দ্র (Space Science and Technology Centre, SSTC) স্থাপনের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। পরবর্তীকালে এই সংস্থার নাম বদলে করা হয় বিক্রম সারাভাই মহাকাশ কেন্দ্র (Vikram Sarabhai Space Centre, VSSC)। আজ কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান (Sattellite Launch Vehicles, SLV)

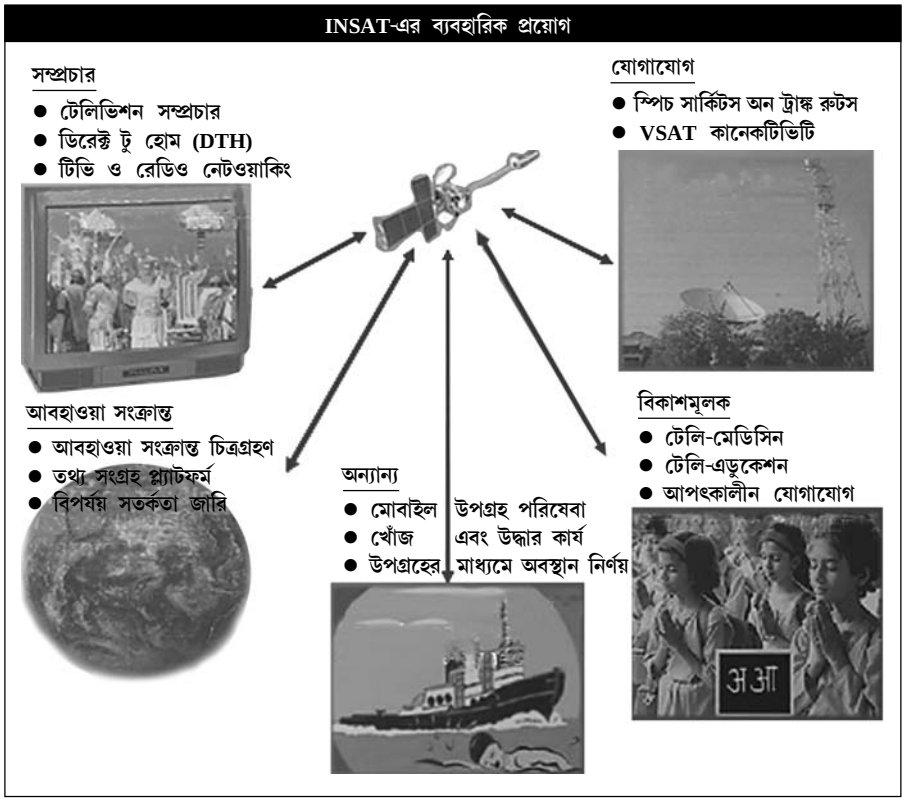

তৈরির ক্ষেত্রে এক অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছে এটি। এই মহাকাশ কেন্দ্রে তৈরি SLV 3 হল প্রথম উৎক্ষেপক, যা ৩৫ কেজি ওজনের 'রোহিণী' নামক কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে ১৯৮০ সালের জুলাইতে। এর ফলে, রাশিয়া, আমেরিকা, চিন, ইউরোপ এবং জাপান—এই ছয় সদস্যের মহাকাশ ক্লাবে প্রবেশের ছাড়পত্র পায় ভারতও। আগেই বলা হয়েছে, তার পরও আমরা পার হয়ে এসেছি অনেকটা পথ। আজকের দিনে ভারতের হাতে আছে নিজেদের তৈরি বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন পাকাপোক্ত উৎক্ষেপক, PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) এবং GSLV (Geo Satellite Launch Vehicle)। শেষোক্ত গোত্রের উৎক্ষেপক ২.৫ টন শ্রেণির মহাকাশযানকে 'Geostationary Transfer Orbit (GTO)' নামক বিশেষ কক্ষপথে স্থাপন করতে সক্ষম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, GTO বলতে বোঝায় পৃথিবীর একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথ, যা ব্যবহার করা হয় নিচের কোনও কক্ষপথ থেকে কোনও মহাকাশযানকে 'Geosynchronous Orbit (GEO)-এ সরিয়ে দেওয়ার জন্য। আর GEO হল পৃথিবীর নিরক্ষরেখার উপর একটি বৃত্তাকার কক্ষপথ, যেখানে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার উচ্চতায় কোনও কৃত্রিম উপগ্রহের (Satellite) গতি পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর যে গতিতে ঘোরে তার সমান।

পাশাপাশি ব্যাঙ্গালোরস্থিত 'ISRO Satellite Centre' (ISAC)-এ মহাকাশযান তৈরির কর্মসূচিতে হাত দেওয়া হয়। 'আর্যভট্ট' এবং 'ভাস্কর' হল ভারতের প্রথম দুই কৃত্রিম উপগ্রহ, যার মাধ্যমে মহাকাশযান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের যোগ্যতার স্বীকৃতি মেলে।

ষাটের দশকের শেষের দিকে, দেশীয় জিওস্টেশনারি উপগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন গবেষণা সমীক্ষা চালানো হয়। মার্চ, ১৯৭০-এ ড. সারাভাই ভারতীয় জাতীয় উপগ্রহ ব্যবস্থা (Indian National Satellite System—INSAT)-এর বিস্তারিত খুঁটিনাটি-সহ রূপরেখা পেশ করেন এক গবেষণা সমীক্ষাপত্রে। অনেক টানাপোড়েনের পর, আন্তর্জাতিক মহলের সাথে সমঝোতা/আলাপ-আলোচনা চালিয়ে ভারতের জন্য জিওস্টেশনারি কক্ষপথে দু'টি

স্থান (Orbital Slots) বরাদ্দ এবং নির্বিঘ্নিত করা হয়। 74°E এবং 93.5°E। INSAT রূপায়ণের জন্য প্রথম সবুজ সংকেত মেলে জুলাই, ১৯৭৭-এ। দু'টি INSAT-I মহাকাশযান তৈরির জন্য বরাত দেওয়া হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'Ford Aerospace Corporation'-কে; ১৯৭৮ সালে। INSAT-I সিরিজের এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ছিল টেলি-যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লবের দূত। কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থার দৌলতে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটে যায়। ISRO একই উপগ্রহের মাধ্যমে তিন ধরনের পরিষেবার মধ্যে সমন্বয়সাধনের এক অভিনব উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসে। টেলিফোন পরিষেবা, টিভি সম্প্রচার এবং আবহবিদ্যার জন্য ভূ-প্রেক্ষণ। টেলিফোন পরিষেবার প্রধান সংযোগ ব্যবস্থাকে যুক্ত করা হয় INSAT-I উপগ্রহের মাধ্যমে। ভূ-পৃষ্ঠস্থিত প্রায় এক হাজার পুনঃসম্প্রচার কেন্দ্রে দূরদর্শনের প্রোগ্রাম রিলে করা হয় এই উপগ্রহের সাহায্যেই। পাশাপাশি মেঘের বিস্তার ও গতিবিধি এবং ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনের গতিপ্রকৃতির নিখুঁত পূর্বানুমান—আবহাওয়া বিজ্ঞানের এই আশীর্বাদ সম্ভব করেছে উল্লেখিত উপগ্রহ ব্যবস্থাই। পরের ধাপে জিওস্টেশনারি উপগ্রহ ব্যবস্থার আরও বিকাশ (Opera Ionisation of Geostationary Satellites) ঘটিয়ে জাতীয় স্তরে এমনকী প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলেও যোগাযোগ স্থাপন সম্ভবপর হয়েছে।

ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির অভিনবত্ব হল, তা মহাকাশ ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যবহারিক কর্মসূচি রূপায়ণের কাজে লাগিয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাঠানো পৃথিবীর বহুমাত্রিক ছবি এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। জমি, জল, বনভূমি, মৎস্যচাষ ক্ষেত্রের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তা ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। পাশাপাশি, এই সমস্ত ছবির সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বানুমান; জলবায়ু পরিবর্তনের সমীক্ষা; বন্যা, ভূমিকম্প এবং সুনামির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন

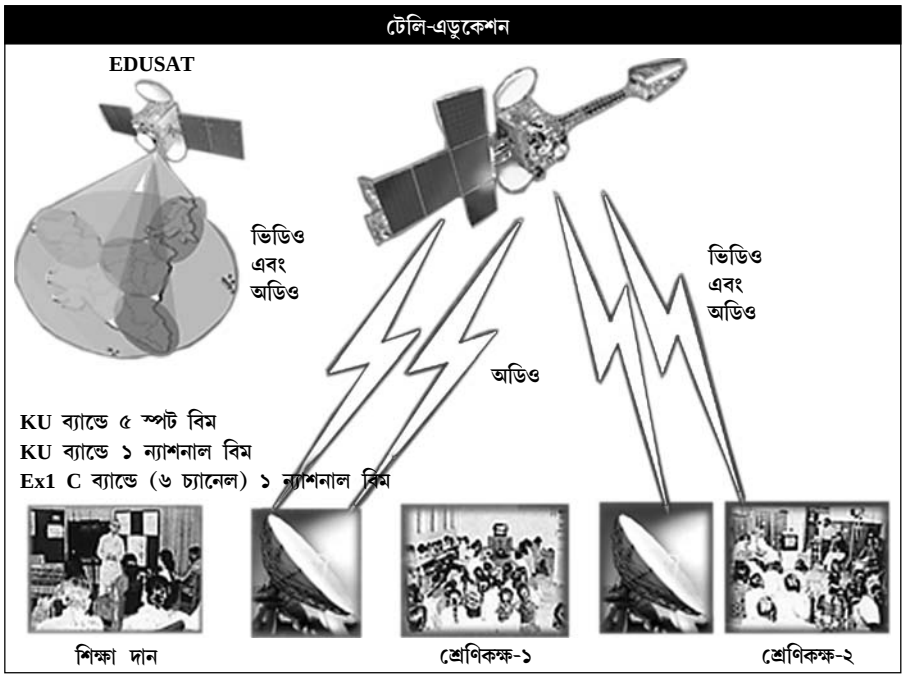

ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান পেতে সুবিধা হচ্ছে। IRS, Resource Sat, Carto Sat, Ocean Sat ইত্যাদির মতো ভূ-প্রেক্ষণ উপগ্রহ-নির্ভর প্রয়োগ কর্মসূচি জাতীয় স্তরের নিয়মিত কর্মকাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(শস্য) চাষ এলাকার (উপগ্রহ) মানচিত্র তৈরি এবং ফসলের বাড়বৃদ্ধির উপর নজরদারি চালানোর ফলে কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব এবং খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে আগাম সতর্কতা জারির কাজ সহজ হয়েছে। এই সতর্কবার্তা থেকে কৃষকরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছেন। মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক বন্দোবস্ত আগেভাগে নিয়ে উঠতে পারছেন। কৃষিসার আমদানি ও ব্যবহারের বিষয়েও সহায়ক হচ্ছে। এদিকে আবার ফসল সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাদিও (Data) একসাথে মিলছে। যেমন—মোট চাষ ও এলাকার কোন কোন জায়গায় কী কী শস্যের ফলন হচ্ছে; জমিতে রোপণ করা চারাগাছের স্বাস্থ্য ভালো না খারাপ; ইত্যাদি। ফলত, ফসল ওঠার কয়েক সপ্তাহ আগেই, আদতে ফলন কী হতে চলেছে তার এক সম্ভাব্য পূর্বাভাস দেওয়া যায়। শস্য সংগ্রহ এবং বিপণনের বন্দোবস্তের জন্য এই পরিযোজন খুব জুরুরি।

বনভূমি আচ্ছাদিত এলাকা দেশের আর এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বনভূমি ক্ষতিগ্রস্থ হয় মূলত দু'ভাবে। প্রথমত, মানুষের হস্তক্ষেপ, যেমন—গাছ কাটা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, দাবানল ইত্যাদির মতো বিপর্যয়। বনাঞ্চলের উপর পর্যায়ক্রমে উপগ্রহের সাহায্যে নজরদারি চালানোর মাধ্যমে পরিবেশের এই সব ক্ষয়ক্ষতির হদিস পাওয়া সহজ হয়। পুকুর, হ্রদ, বাঁধ-জলাধার ইত্যাদির জলের গুণমান নির্ধারণের ফলে জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশি সুফল পাওয়া যায়। 'রাজীব গান্ধী পানীয় জল মিশন' নামক ISRO-র উদ্যোগে চালু অগ্রণী প্রকল্পটি এক হিসাবে অভিনব। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাঠানো চিত্র ব্যবহার করে তথা বাস্তব সত্যাসত্য যাচাই করে কোন কোন এলাকায় জল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সব তথ্য ব্যবহার করেই রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে কূপ খোড়ার কাজ হাতে নেওয়া হয়। সুফলও মিলেছে হাতেনাতেই। এই সব তথ্য না মিলিয়ে খনন করা কুঁয়ো থেকে যেখানে পাওয়া যাচ্ছে ৩০ শতাংশ জল; সেখানে তুলনায় ৭০ শতাংশ পর্যন্ত জল উঠছে মিশনের আওতায় খোড়া কূপ থেকে। এর ফলে শুধু কুঁয়ো থেকে তোলা জল খাতেই প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

সম্ভাব্য মৎস্য শিকার এলাকা (Fishing Zone) চিহ্নিতকরণ হল আরেকটি কর্মকাণ্ড;

যা হাজার হাজার ধীবরের কাজে লেগেছে। ভূ-প্রেক্ষণকারী উপগ্রহ 'Ocean Sat'-এর তথ্যের ভিত্তিতে সাগরের জলের রঙ, জলের উপরিতলের উষ্ণতা, বাতাসের গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সমুদ্রের কোন এলাকায় ব্যাপক পরিমাণে মাছের ঝাঁক অবস্থান করছে, তা চিহ্নিত করা সম্ভব। সেই তথ্য আবার সরাসরি উপগ্রহের সাহায্যে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ধীবর বসতিগুলিতে। এই বন্দোবস্তের দৌলতে ধীবররা সাগরে ইতস্তত মাছের খোঁজে ঘুরে না বেড়িয়ে সরাসরি অভীষ্ট অঞ্চলে পৌঁছে যেতে পারে নৌকা নিয়ে। এভাবে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সাগরে মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে মাছের সংগ্রহ প্রায়শই দ্বিগুণেরও বেশি হয়। পাশাপাশি সময় এবং জ্বালানির সাশ্রয়ও হয় বড়ো মাত্রায়। গুজরাত, কেরালা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল অঞ্চলে এইভাবে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য শিকার ব্যবস্থা চালু আছে।

জল বিভাজিকার বিকাশ হল রিমোট সেন্সিং (প্রযুক্তি) প্রয়োগের আর একটি ক্ষেত্র। দেশের অধিকাংশ গ্রাম ছোটো-বড়ো জলাশয়/জলাভূমির আশপাশে গড়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে কর্ণাটকের ছয়টি জেলার কথাই ধরা থাক। এই সমস্ত জেলায় জলাশয়ের আশপাশের সমস্ত এলাকার উপগ্রহ তথ্য মানচিত্র প্রস্তুত করে চাষাবাদ, সামাজিক বনসৃজন ইত্যাদির জন্য জমির দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কীভাবে কোনও ভূ-খণ্ডের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব, সে বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কী ধরনের ফসল চাষ করা উচিত, বৃষ্টিসেবিত চাষের কাজে বৃষ্টির জলের সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি, জলের অপচয় বন্ধ করা ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের তথা গ্রামবাসীদের তথ্য সরবরাহ করে জল ও জমির মতো প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আর্থিক লাভের ক্ষেত্রে উন্নতি নজরে আসছে। সূচনার তিন বছর পর পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, গড় আয়ের স্তর প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এই উদ্যোগের ফলে। সেচ প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চলে কৃষিকাজের উপর নজরদারি; রাস্তা নির্মাণ/বিদ্যুতের খুঁটিপোতা ইত্যাদির জন্য পঙ্‌ক্তি বিন্যাস; শহরাঞ্চলের বিকাশের জন্য জমির সঠিক ব্যবহার হল এরকম আরও কয়েকটি ক্ষেত্র যেখানে উপগ্রহ তথ্য (Satellite data) বেশ কাজে আসছে।

ভারতীয় ভূ-খণ্ডের বিস্তার প্রায় ৩২.৯ লক্ষ বর্গকিলোমিটার জুড়ে। লম্বা চওড়ার প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার। এই সুবিশাল ভৌগোলিক এলাকার প্রতিটি কোণ-কানাচের মধ্যে সংযোগসাধন করতে সক্ষম এরকম একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি গড়ে তোলা যায়, তার সুফল কী হতে পারে—সে সম্পর্কে অনেক আগেভাগেই ওয়াকিবহাল ছিলেন ভারতে মহাকাশ কর্মসূচির প্রতিষ্ঠাতা 'জনক' ড. বিক্রম সারাভাই। আর কোনও উপায়ে এই বিপুল আয়তন এলাকার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের বন্দোবস্ত সম্ভবপর হ'ত না। গত শতকের ষাটের দশকের শেষের দিকে তার এই অগ্রণী চিন্তাভাবনাই 'জিওস্টেশনারি যোগাযোগ উপগ্রহ' তৈরি এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিল। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, NASA-র সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি এক অভূতপূর্ব কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করেন। পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে গিয়ে ইতোমধ্যেই কাজ করে চলেছে এমন একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে ভারতের ওপর সরিয়ে এনে দেশের মধ্যাঞ্চলের দু'হাজার প্রত্যন্ত গ্রামে সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক এক নিরীক্ষা চালানো। এই কর্মসূচির নাম রাখা হয়েছিল "Satellite Instructional Television Experiment" (SITE)। অন্যতম অভিপ্রায় ছিল দূর দূর এলাকায় অবস্থিত গ্রামের মানুষদের সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন টেলিভিশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, চাষাবাদের সঠিক সুফলদায়ী পন্থাপদ্ধতি বিষয়ে সচেতন ও সুশিক্ষিত করে তোলা। প্রায় বছরখানেক ধরে চালানো হয় এই কর্মসূচি। সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে হাতে নেওয়া সবচেয়ে সফল কর্মসূচির অন্যতম হিসাবে স্বীকৃতিও মিলেছে রাষ্ট্রসংঘের তরফে।

ভারতে প্রত্যন্ত দূর দূর এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বসতিগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হল জিওস্টেশনারি উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ। বিনোদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে DTH (Direct to Home) টেলিভিশন পরিষেবা। শয়ে শয়ে টেলিভিশন প্রোগ্রাম কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে রিলে সম্প্রচারের দৌলতে পৌঁছে যাচ্ছে দেশের যে কোনও প্রান্তে। শুধু বাড়ির ছাদে একটা ছোট্টো ডিস অ্যান্টেনা বসানোর অপেক্ষা। প্রত্যন্ত এবং অগম্য এলাকায় আপৎকালীন যোগাযোগের মতো অত্যন্ত জরুরি কাজকে সুনিশ্চিত করা

গেছে কৃত্রিম উপগ্রহের সৌজন্যেই। বিপর্যয় মোকাবিলা তথা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তা বরদান বিশেষ।

মহাকাশ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে জাগতিক বিবিধ সমস্যার সমাধান সম্ভব সে ব্যাপারে ভারতকে পথিকৃত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। 'টেলি-মেডিসিন', 'টেলি-এডুকেশন' এবং 'ভিলেজ রিসোর্স সেন্টার' ইত্যাদি অভিনব ধারণার মতো সমাজ-সংসারের বিশেষ উপকারে আসে এমন কর্মসূচি চালিয়ে আসছে ভারত। টেলি-মেডিসিন প্রকল্পের সাহায্যে ISRO দেখিয়েছে, উচ্চ গুণমানের চিকিৎসা পরিষেবার মতো অত্যন্ত জরুরি উদ্যোগ কীভাবে প্রত্যন্ত গ্রামের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। দেশের 'সুপার স্পেশিয়ালিটি' হাসপাতালগুলি সব মেট্রো শহরগুলিতে অবস্থিত। কাজেই কোনও গ্রামবাসীকে যদি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়, তবে তাকে শয়ে শয়ে কিলোমিটার পথ উজিয়ে আসতে হবে বড়ো শহরে; যাতায়াতেই চলে যাবে বেশ কয়েকটা দিন। টেলি-মেডিসিন ব্যবস্থার দৌলতে রুগীর রোগ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগের সাহায্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ সমস্ত তথ্য খুঁটিয়ে দেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রুগীর সাথে টেলি-কনফারেন্স মারফৎ কথাবার্তা চালিয়ে ওষুধপত্রের নাম জানিয়ে নিদান দিচ্ছেন অথবা এর পর অন্যান্য কী করণীয় সেসব পরামর্শ দিচ্ছেন। দেশের বড়ো মাপের নামী বিশেষজ্ঞ হাসপাতালগুলি এই সব পরিষেবা জুগিয়ে স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে গ্রামবাসীদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। আজকের দিনে দেশের গ্রাম এবং আধা-শহর অঞ্চলে অবস্থিত প্রায় ৩৮২-টি হাসপাতল মেট্রো শহরগুলির ৬০-টি 'সুপার স্পেশিয়ালিটি' হাসাপাতালের সঙ্গে টেলি-মেডিসিন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত। এই নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে ১৬-টি মোবাইল ভ্যানও। টেলি-মেডিসিন বন্দোবস্তের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন বছরে প্রায় ৩ লক্ষেরও বেশি রুগী। দেশের প্রত্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলের সেনা ছাউনি/ঘাঁটিতে এ ধরনের পরিষেবা জোগায় প্রতিরক্ষা কৃত্যক-এর 'বেস হাসপাতাল'-গুলি।

আগেই আমরা SITE নামক পরীক্ষামূলক কর্মসূচির উল্লেখ করেছি। কৃত্রিম উপগ্রহকে কীভাবে শিক্ষার প্রসারে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যায়, সেই মূল্যবান অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি SITE-এর দৌলতে। দেশে সুদক্ষ শিক্ষকের ঘাটতি বরাবরই। এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার এক অভিনব উপায় হল, শয়ে শয়ে স্কুল ও কলেজে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পাঠদানের ভাষ্য একসাথে সম্প্রচার। ক্লাসে বসে যারা শুনবে, সেই শিক্ষার্থীদের সামনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সঙ্গে টেলি-কনফারেন্সের মাধ্যমে কথাবার্তা চালিয়ে সংশ্লিষ্ট পাঠ বিষয়ে বক্তব্য বিনিময়ের সুবিধা থাকে। বহু রাজ্যেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলির জন্য তথা শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য এই ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, IIT এবং IIM-গুলিও তাদের অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে নিজেদের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের পাঠদান ভাষ্য ভাগ করে নিতে এই পদ্ধতির সাহায্য নেয়। এভাবেই, প্রত্যন্ত দূর্গম এলাকাও দেশের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার সুফল পেতে পারে। ISRO ২০০৪ সালে শুধুমাত্র দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োগের উদ্দেশ্য নিয়ে 'EDUSAT' নামে এক কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে। দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ নির্ভর দূরশিক্ষা ব্যবস্থার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। EDUSAT-কে মূলত একাজেই লাগানো হয়। আজকের দিনে দেশের প্রায় ষাট হাজার শ্রেণিকক্ষকে EDUSAT নেটওয়ার্কের সাথে জুড়ে গ্রাম ও আধা শহর এলাকায় বসবাসকারী প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের এক বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর সামনে উচ্চমানের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আর একটি অন্যতম ক্ষেত্র, দেশের মহাকাশ কর্মসূচির দৌলতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে যাতে। বন্যা বা ভূমিকম্পের মতো ঘটনায় ভূ-প্রেক্ষণ উপগ্রহ তৎক্ষণাৎ ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান জানিয়ে দেয় এবং এই সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর তার প্রভাব উপশমে কী পন্থাপদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার, সে বিষয়েও তথ্য সরবরাহ করে। সাইক্লোন অথবা প্রবল বর্ষণের ঘটনার ক্ষেত্রে INSAT উপগ্রহ নির্ভর ব্যবস্থা প্রধান অবলম্বন। মেঘের প্রকৃতি ও গতিবিধি সংক্রান্ত উপগ্রহ চিত্র এ ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা আগাম চিহ্নিত করে। ফলে দ্রুত সতর্কবার্তা জারি করা যায়। বঙ্গোপসাগর এবং আরবসাগরে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি হওয়ার ঘটনা আন্দাজ করা যায় বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই। এই ঘূর্ণিবাত্যার

মূলকেন্দ্র (Core)-এর গতিবিধি অনুসরণ করে ভূ-খণ্ডের কোথায়, কখন, কত গতিতে তা আছড়ে পড়তে চলেছে সে বিষয়ে অনেক আগে থেকেই পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব।

এই সমস্ত তথ্য কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক আগাম সতর্কতাজারি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায়। ফলত, সময়মতো সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়। এর নিটফল হল, উপগ্রহ তথ্য পাওয়ার আগের যুগে যেখানে হাজার হাজার জীবনহানি হ'ত, এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে; সেখানে এই জীবনহানির সংখ্যাটা এখন প্রায় নগণ্যে নামিয়ে আনা গেছে। বন্যা বা সাইক্লোনপীড়িত অঞ্চলে যোগাযোগের সমস্ত উপায় যখন ব্যর্থ হয়; সেখানে একমাত্র রাস্তা খোলা থাকে উপগ্রহ যোগাযোগ।

ভূ-প্রেক্ষণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে সংহতিসাধনের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক উদ্যোগ হিসাবে গ্রামীণ সম্পদ কেন্দ্র (Village Resource Centre—VRC) স্থাপনের একটি অগ্রণী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। স্থানীয় যাবতীয় তথ্য পরিসংখ্যান, যেমন—জমি ও জলসম্পদের তপশিলভুক্ত মানচিত্র, গ্রামে বসবাসকারী পরিবারগুলির সম্পর্কিত তথ্য পরিসংখ্যান ইত্যাদি উপগ্রহের মাধ্যমে VRC-এর কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা এই সব তথ্য পরিসংখ্যানের নাগাল সেখান থেকে সহজেই পেতে পারেন। তা ব্যবহার করে নিজেদের এই সব সহায়সম্পদ আরও ভালো পরিকল্পনামাফিক কাজে লাগাতে পারেন। এই ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং রাজস্ব কর্তৃপক্ষকে যুক্ত করলে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীরা তাদের থেকে এ কাজে প্রয়োজনীয় পরামর্শও সহজেই পেতে পারেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলি তাদের পরিষেবার বহর দ্বিগুণ বাড়িয়ে টেলি-মেডিসিন এবং টেলি-এডুকেশন কেন্দ্র হিসাবে গ্রামবাসীদের কাজে আসতে পারে। এই এক জানালা ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে প্রায় ৪৭৫-টি গ্রামীণ সম্পদ কেন্দ্রের মাধ্যমে। পরীক্ষামূলকভাবে এই উদ্যোগ চালু করা হয় দেশের মোট ২১-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে।

দিশা নির্দেশন ব্যবস্থা (Navigation System)-এর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের GPS-এর উপর অত্যন্ত বেশি নির্ভর করতে হ'ত। এই অতি নির্ভরশীলতা থেকে রেহাই পেতে ভারত তার নিজস্ব দিশা নির্দেশন ব্যবস্থা (IRNS)-র বিকাশ ঘটিয়েছে; যা দেশের ভূ-খণ্ডের মধ্যে তথা প্রতিবেশী দেশের এলাকায় নিখুঁত অবস্থানের এবং সময়ের সিগন্যাল পাঠায়। অভিনব এই ব্যবস্থায় জিওস্টেশনারি কক্ষপথে সাতটি উপগ্রহের এক মণ্ডলীকে ব্যবহার করা হয়। এর থেকে প্রতিরক্ষা কৃত্যক ব্যাপক উপকৃত হচ্ছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর দৈনন্দিন প্রয়োজনেও উপগ্রহ যোগাযোগ এবং ভূ-প্রেক্ষণ তথ্য ব্যবহার করা হয়।

কোনও জাহাজ, নৌকা বা বিমান যাত্রাপথে বিপদে পড়ে সাহায্যের এবং উদ্ধার কাজের জন্য সংকেত পাঠালে সেই সিগন্যাল রিলে করার জন্য ট্রান্সপন্ডারও মজুত আছে INSAT সিরিজের উপগ্রহে। উপগ্রহ তথ্যের অনুপূরক হিসাবে, ভূ-খণ্ড এবং সাগর অঞ্চলে হাজার হাজার স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্রের থেকে পাওয়া ভূ-পৃষ্ঠ প্রেক্ষণ তথ্যাদিও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, বিকিরণ এবং মৃত্তিকার আর্দ্রতা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি (Real time data) সংগ্রহ করে রিলে করা হয় জিওস্টেশনারি উপগ্রহ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে।

এটা ঠিক যে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সুফলদায়ী বহু কর্মসূচি ISRO রূপায়ণ করেছে এবং এখনও করে চলেছে। কিন্তু আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি কেন, কখন এবং কীভাবে—সেই মৌলিক প্রশ্নগুলির বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে তার দায়বদ্ধতাও বিস্মৃত হয়নি এই প্রতিষ্ঠান। সে কারণেই চন্দ্র ও মঙ্গল অভিযানে সামিল হওয়া। আমাদের দুই মহাকাশযান 'চন্দ্রায়ন' এবং 'মঙ্গলযান' তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রতিস্থাপিত হয়ে অত্যন্ত কার্যকর তথ্যের জোগান দিয়ে চলেছে। বিশেষত, প্রথমবার চাঁদে জলের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ দিয়েছে; এবং হিলিয়াম থ্রি-র বিপুল সঞ্চয়ের খবর জানিয়েছে—যা এক ঐতিহাসিক খোঁজ।

মহাকাশ প্রযুক্তির বিকাশের সূত্রেই ঘটনাচক্রে আরও কিছু ক্ষেত্রে কিছু উপজাত আমাদের হাতে এসেছে। রোগ নির্ণয়, পর্যবেক্ষণ এবং জটিল অণু গঠন এরকমই কিছু ক্ষেত্রের উদাহরণ। ভারতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য হৃদপিণ্ডের ভালভ্, হৃদপিণ্ডের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পাম্প স্টেন্ট, পোলিও আক্রান্ত রোগীদের জন্য ক্যালিপারস্ ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্য বিশেষ ধরনের যৌগিক পদার্থের উদ্ভাবনা মহাকাশ প্রযুক্তি গবেষণার সূত্রেই; উপজাত হিসাবে।

মহাকাশযান এবং রকেটের জটিল প্রযুক্তিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে ISRO যথার্থই ড. সারাভাই-এর দেখানো পথেই এগিয়ে গেছে। পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠান, সাধারণ মানুষের জীবনকে ছুঁয়ে যায় এমন উদ্ভাবনার বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একটি নিরপেক্ষ সংস্থা এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছে যে, সরকারের তরফে বিনিয়োগের সাপেক্ষে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সুফল যা মিলেছে, তার ব্যাপ্তি অনেক অনেক বেশি। কাজেই সবশেষে একথা বলাই যেতে পারে যে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় মানোন্নয়নে মহাকাশ প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচি ভারতকে বিশ্বের মঞ্চে নেতার আসনে পৌঁছে দিয়েছে।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ISRO)-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান। ইমেল : gmnairng@gmail.com)

শিক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
এক উপায় এবং এক উদ্দেশ্য

*আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অবদানের উপস্থিতি ও প্রভাব এতটাই বেশি যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির কিছুটা জ্ঞানগম্যি ছাড়া জীবনযাপন বলতে গেলে অসম্ভব। যুক্তিসম্মত চিন্তাভাবনা, তথ্যাদি কাজে লাগানোর সামর্থ্য, সমস্যা আসান এবং আরও একগোছা ক্ষমতা হল বিজ্ঞান চর্চা তথা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিক জগতের উপযোগী নাগরিক গড়ে তুলতে তাই বিজ্ঞান শিক্ষাকে এক উল্লেখযোগ্য বলে সওয়াল করেছেন নিবন্ধকার—***রাজারাম এস. শর্মা**

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জীবনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা থেকে স্বতন্ত্র এক ক্রিয়াকাণ্ড রূপে চিহ্নিত করা যেত এই কিছু দিন আগেও। বিজ্ঞানের অন্বেষণে ব্রতী মানুষজনকে আমরা করতাম পরম সমাদর। এই অনুসন্ধানের ফলও চোখে পড়তো অচিরাৎ এবং জীবনের গুণমান উন্নত করতে এর মূল্য স্বীকৃতি পেত।

বেশ কিছু নামজাদা মনীষী বিজ্ঞান চর্চাকে এক পৃথক কর্মকাণ্ড হিসেবে খতিয়ে দেখেছেন এবং জ্ঞান সৃজন ও উপলব্ধির অন্যান্য প্রয়াসের সঙ্গে তুলনা করে অনেক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। বিজ্ঞানের প্রয়াসের এই বিশেষ গুণ বা লক্ষণ একে অন্যান্য ধরনের অনুসন্ধান থেকে উৎকৃষ্ট করেছে এবং এর আবিষ্কারাদি বেশি নির্ভরযোগ্য।

গত কয়েক দশকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দূরন্ত অগ্রগতি অবশ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অতি সরলীকৃত ধারণাকে অস্পষ্ট করে তুলেছে। একদিকে, মানবজাতির প্রায় কোনও প্রচেষ্টাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানের প্রভাবমুক্ত নয়, পক্ষান্তরে, 'বিজ্ঞানীর' দ্বারা গৃহীত কলাকৌশল, প্রয়োগ, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির রকমফের এসবকে বিধিবদ্ধ করা কঠিন করে ফেলেছে।

শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করার ক্ষেত্রে এই দুই অবস্থার যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। এই কিছুদিন আগেও, বিজ্ঞানকে এক স্বতন্ত্র বিষয় ও স্কুল পাঠক্রমের এক আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করাই ছিল দস্তুর এবং সেটাই সম্ভবত ঠিক। এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে নিছক কাজের জগতের জন্য প্রস্তুতিটাই স্কুল-শিক্ষা রূপে বিবেচিত হয় না। সুতরাং, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রযুক্তিবিদ বানানোটা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহলে লেখাপড়ার এক বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানকে এই স্টেটাস দেওয়া কতখানি যুক্তিসঙ্গত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অবদানের উপস্থিতি ও প্রভাব এতটাই যে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির কিছুটা জ্ঞানগম্যি ছাড়া জীবনযাপন বলতে গেলে অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, জীবন কাটাতে গেলে, বিদ্যুৎ বা মানুষের শারীরক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞাত এমন কোন ব্যক্তির কথা কি চিন্তা করা সম্ভব? একটা গড়পড়তা মানুষ, দিনে হাজার হাজার না হলেও, নিদেনপক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কয়েক শ' ফল ও প্রক্রিয়ার সংস্পর্শে আসে—মামুলি দাঁত মাজার ব্রাস ও মাজন থেকে খবরের কাগজ, গাড়িতে যাতায়াত, খাবার-দাবার, বিনোদন, গা এলিয়ে দেওয়ার জন্য খাটের তোষক, আর সবসময় হাতের কাছে হাজির মুঠোফোন, যার জন্য সবাইকার হাতের আঙ্গুলের নিশপিশানির কথা নাই বা বললাম। একই সঙ্গে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সব অবদান সম্পর্কে পড়ুয়াদের অবহিত করার এক উপায় হিসেবে স্কুলের পঠন-পাঠনের ধারণা করা সম্ভব নয়, কাঙ্ক্ষিতও নয়।

যুক্তিসম্মত চিন্তাভাবনা, তথ্যাদি কাজে লাগানোর সামর্থ, সমস্যা আসান এবং আরও একগোছা ক্ষমতা হল বিজ্ঞান চর্চা তথা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এছাড়াও, এসব মুনশিয়ানার অধিকারী ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদ না হলেও, জীবনপথে আরও ভালোভাবে চলতে পারবে। আধুনিক জগতের নাগরিক গড়ে তুলতে তাই বিজ্ঞান শিক্ষাকে এক উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ বলা যেতে পারে।

আজ হোক আর দশ দিন পরে হোক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক রহস্যময় ক্ষমতা আছে তার অশুভ দিকগুলি দেখিয়ে দেওয়ার। বহুল প্রচলিত এক যুক্তিতর্ক আছে যে সহজাত মন্দ দিকগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে থাকে না। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসের ক্ষমতা ধরে এবং কখনো-সখনো তা সংশোধনাতীত। পরিণতির জন্য মানবজাতিকে অনুশোচনা বা মাঝে মাঝে ভোগান্তির দিকে ঠেলে দিতে এটা মন্দলোক ও লোভীদের কাছে এক সুবিধাজনক হাতল।

একদিকে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের সংজ্ঞার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে; অন্যদিকে তখন এর নেতিবাচক দিকের জন্য, একে সাদরে গ্রহণ করতে তা আমাদের হুঁশিয়ার ও সংশয়ী করে তুলেছে। পরিবেশগত অবক্ষয়, ওষুধ-বিষুধের ক্ষতিকর প্রভাব, গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র, অন্যান্য প্রাণীর অবলুপ্তি,

খাদ্য ও জলের অনটন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির লাগামছাড়া প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল। বিস্তর আশা-ভরসা ও উদ্যম নিয়ে অনুসৃত উন্নয়নের মডেলগুলিই অচিরে উলটো পথে হাঁটতে দেখা গেছে। উপযুক্ত দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতাযুক্ত, অর্থাৎ সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি কি সম্ভব? সেটা কি হবে এক মুশকিল আসান? কিসে আসবে দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা এবং সেই দায়িত্বভার কি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে দেওয়া যেতে পারে?

আমরা প্রবল আশাবাদী যে এটা শুধুমাত্র বাঞ্ছিত নয়, সম্ভবও।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পঠন-পাঠনের কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আমরা বাছাই করার চেষ্টা করেছি :

● এটা যেসব অবাক কাণ্ডের জট খুলেছে তা শ্রেণিকক্ষে হাজির করা। প্রকৃতির বিস্ময় এবং যেভাবে তার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা কখনই অবাক মানায় যতি টানে না, কৌতূহলীদের প্রণোদনা জোগায় এবং তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানের জন্য আরও বহু প্রশ্ন তোলে। তরুণ চিত্তে এই স্বভাব বা গুণ সঞ্চারিত হলে বিজ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তা নিঃসন্দেহে এক বিনিয়োগ।

● যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজকর্ম, পরীক্ষা-নিরীক্ষা—গবেষণার ছক কষা এবং সমস্যা নিষ্পত্তি করার প্রশিক্ষণ। এই অনুশীলন মারফত তরুণ মানসিকতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানকে কাজে লাগানো, দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করায় রপ্ত হয়ে ওঠে।

● বিজ্ঞানের পন্থাপ্রকরণে প্রশিক্ষণ হচ্ছে বিশ্ব বীক্ষারও এক তালিম—কার্য ও কারণে বিশ্বাস, যা কিনা সুসম্বন্ধভাবে প্রয়াসের মাধ্যমে হদিশ করা যায়; আবিষ্কারাদির ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত সংশয় আরও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে, আরও সূক্ষ্মতা ও পরিমার্জনা আনে এবং এর ফলে জ্ঞান বা বিদ্যাবত্তাকে আরও মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করায়। নতুন নতুন ঘটনা বা সত্যকে মেনে নেওয়া, এত দিনকার ধ্যানধারণা সংশোধন করা, এমনকি তা পুরোদস্তুর বিসর্জন দেওয়া, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে দুর্বল ও অক্ষমদের তাদের দুঃখদুর্দশা থেকে রেহাই দিতেও এটা অবদান রাখে।

সব মিলিয়ে, বিদ্যালয়-শিক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গ্রহণের এসব এক অকাট্য যুক্তিজাল। আধুনিক প্রযুক্তির অবদান শ্রেণিকক্ষে কয়েকটি পুরোদস্তুর আনকোরা মাত্রা সংযোজন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্বেষণ থেকে মেলা এসব অবদান ক্লাসরুমের চার দেওয়ালকে প্রসারিত করার ক্ষমতা ধরে, বস্তুত দেওয়ালের ঘেরাটোপ তারা হটিয়ে দিচ্ছে।

এই তো কিছুদিন আগেও, তথ্যের সুলুকসন্ধান মিলতো একমাত্র ছাপার বইতে। প্রজন্মের পর প্রজন্মের জ্ঞানস্পৃহার চাহিদা মিটিয়েছে গ্রন্থাগার। এই প্রক্রিয়া অবশ্য ছিল বড়ো বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ, সময়সাপেক্ষ; ফলে অনেক আবিষ্কার দেরি হয়ে যেত। তথ্যের নাগাল মেলা এখন ঢের সোজা, চাইবামাত্র তা সকলে পায়—চটজলদি বিকাশের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এর কাছে অনেকখানি ঋণী।

শুধুমাত্র ছাপা বইপত্রের জগৎ নয়, এখন 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব'-এ থাকে তথ্য এবং ভিডিওর মাধ্যমে ঘটনাবলির দৃশ্যও। ত্বরিত যোগাযোগ সাহায্য করেছে তথ্য বিনিময়, সাজসরঞ্জাম ও সম্পদ আদান-প্রদান, সামর্থ্যের যৌথ ভাণ্ডার গঠন এবং প্রকৃতিগতভাবে একযোগে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে।

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যায় এমন সব মিডিয়া ও মাল্টিমিডিয়া সামগ্রী এবং তাদের কী কাজে লাগানো যেতে পারে এ নিয়ে লেখাজোখা হয় বিস্তর। একরঙা ব্ল্যাকবোর্ডকে বর্ণিল করে পড়ানো-লেখানোয় বিপ্লব আনার দাবি করা হয়েছে। গবেষণায় এ দাবি টেঁকেনি অবশ্য। শেখায় উন্নতির বদলে পড়ুয়ারা বরং কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। বিজ্ঞানের ঘটনাকে এটা বিজ্ঞান বলে চালিয়ে দিতে জুগিয়েছে উৎসাহ, বিজ্ঞানের গভীর চর্চায় পড়ুয়াদের নিয়োজিত হওয়ার পথে তা বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এহেন মামুলি প্রয়োগ ছাপিয়ে বহুদূরে পাড়ি দিতে পারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। স্কুল-শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের স্বপ্ন—পড়ুয়াদের বিচারবুদ্ধি ও সামর্থ্যের উন্নয়ন বাস্তবে রূপায়ণের মাধ্যমে তারা শ্রেণিকক্ষে আনতে পারে মৌলিক রদবদল।

এসব সম্ভাবনা থেকে ফয়দা তুলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কীভাবে ক্লাসকে পালটে দিতে পারে এবং শ্রেণিকক্ষের কিভাবে নিজেকে বদলে ফেলা উচিত?

পাঠ্যবইয়ের বাঁধাধরা গতের জ্ঞানে শিক্ষককে বেড়ি পড়িয়ে রাখার দরকার নেই আর। লেখচিত্র বা গ্রাফের মাধ্যমে তথ্যকে তুলে ধরায় তার কুশলতা পড়ুয়াদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় হবে, সেই সঙ্গে সঙ্গতে থাকবে মিডিয়ার জমকালো উপস্থাপনা। শ্রেণিকক্ষে ওয়েবের সঙ্গে সংযুক্ত এক কম্পিউটার ও প্রজেক্টার থাকলে, শুধুমাত্র বিজ্ঞানের শিক্ষক নয়, যথেষ্ট সুবিধে হবে সমাজ বিজ্ঞান বা ভাষা মায় কলা শাখার শিক্ষকদেরও। তবে এজন্য ধরে দিতে হবে যে শিক্ষক ও তার ছাত্রছাত্রীরা তথ্য নিয়ে সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত। তাদের নতুন নতুন তথ্যাদির খোঁজখবর, বাছাই, চিন্তাভাবনা থাকা দরকার।

এর সঙ্গে জোড়া যাক পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্ভবপরতা এবং জ্ঞান সম্পর্কে "যদি ঘটে তাহলে কী হবে" এর তত্ত্বতালাশে পড়ুয়াদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কল্পনা করুন, একটা গ্রাফ তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে একটি চল (ভেআরিআবল) নাড়িয়ে-চাড়িয়ে বা এমনকি বাদ দিয়েও। সব বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বহু ধরনের অ্যাপ্লিকেশন এখন হাতের গোড়ায় মেলে এবং শেখার কাজে লাগানো যায়। পড়ুয়াদের ক্ষমতা ও আগ্রহ বাড়ানোর জন্য ইন্টারঅ্যাকটিভ সিমুলেটর, অনলাইন মাপচিত্র ও ভূগোলক, তথ্য ও তার উপস্থাপনা, ইন্টারঅ্যাকটিভ অভিধান ও সমার্থ শব্দকোষ সৃজনশীলভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। বিশেষত বিজ্ঞান ও অঙ্কের ক্ষেত্রে, কম্পিউটারে পরিমাপক যন্ত্রাদি জুতে দেওয়া, প্রকৃত তথ্য ঢোকানো হলে মিলতে পারে চমৎকার ফল। বিজ্ঞান চর্চা করা প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের নাগালের মধ্যে পড়ে।

এটা অবশ্যই প্রথাসিদ্ধ সাজসরঞ্জাম ও সহায়সম্পদ—ল্যাবরেটরি মারফত যা করা

সম্ভব তার বাড়তি কিছু। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্ভাবনা ল্যাবের পরিসর বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, ল্যাবের অস্তিত্ব না থাকলেও তার সুযোগ-সুবিধে মেলার ব্যবস্থা করে দিতে পারে এবং এমন এক রূপে তার বন্দোবস্ত করতে পারে যে, আরও চটপট তা কাজে লাগানো যায় এবং পড়ুয়ারা তা সুদক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারে।

তথ্য ও খবর ঝটিতি নাগালের মধ্যে পাওয়ার সুযোগ উদ্যমী শিক্ষকদের জন্য খুলে দিয়েছে নতুন নতুন পথ বা উপায়। সম্ভাবনার অনুসন্ধানে সহায়সম্পদের অনটন কাটিয়ে ওঠার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে শিক্ষকের কল্পনাশক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও পারগতা। খবর থাকলে বা বর্তমান সময়ের জ্ঞান থেকে তা ব্যাখ্যা করতে পারলে, শ্রেণিকক্ষে সেটা তুলে ধরা যায়।

মার্কামারা শ্রেণিকক্ষে সব পড়ুয়ার জন্য থাকে ধরাবাঁধা গতের একই খবর। শিক্ষক খবর জোগাবেন ছাত্রকে এই তত্ত্বেও তারা বিশ্বাসী। এই দুই ধ্যানধারণা গুঁড়িয়ে দিলে খুলে যেতে পারে সম্ভাবনার নতুন নতুন জগৎ। কোনও একটি বা নানা প্রসঙ্গের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার জন্য ছাত্রদের একক বা দলগতভাবে বিয়োজিত করলে শ্রেণিকক্ষের সময় ও পরিসর বাড়তে পারে। মুদ্রণ মাধ্যমের এক মূলগত সীমাবদ্ধতা হল পাঠ্যবইয়ে লেখার গণ্ডি বেঁধে দেওয়া। এখন আর শ্রেণিকক্ষে কী এবং কতটা শেখানো হবে তার কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই।

স্কুলশিক্ষার আর এক দিক হচ্ছে বিদ্যার্থীদের বয়সভিত্তিক স্তর বা পরত। বড়ো বড়ো বিদ্যালয়ে তো একই বয়সের পড়ুয়াদের জন্য আছে কত না সেকশন। এর দরুন রোল মডেল খুঁজে পেতে, তাদের কাছ থেকে শিখতে-জানতে, একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং মূলত একত্রে জীবন কাটানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় ছাত্ররা। এহেন কৃত্রিম বিভাজনের পাঁচিল ভেঙ্গে প্রজেক্টের কাজকর্ম শিক্ষা ত্বরান্বিত করে। প্রযুক্তির সঞ্চার ঘটলে এটা বিপুলভাবে করা সম্ভব।

নিজের তথ্য ভাঁড়ারের খালি খালি ভাব এবং সহায়সম্পদের নাগাল পাওয়ার অপ্রাচুর্য থাকায় শিক্ষকরা নিজেদের পায়ে বেড়ি লাগিয়েছেন, নিজেদের মেলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যান্য শিক্ষক ও এমনকি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সংযোগ এই ঘাটতি সামলে নিতে সাহায্য করে। ল্যাবরেটরির সঙ্গে ছাত্রদের যুক্ত করাটা শ্রেণিকক্ষে যন্ত্রপাতি না মেলার সমস্যা অনেকখানি ঘোচাবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সাগ্রহে বরণ করলে শ্রেণিকক্ষে নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ যাবে খুলে। প্রকৃতির অবাক ঘটনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান ও প্রক্রিয়া শ্রেণিকক্ষের কাছে তুলে ধরা, বাইরের জগৎকে ক্লাসরুমে নিয়ে আসাটা অনেক অনেক তথ্য-খবরের সুযোগ এনে দেবে। উদ্যমশীল শিক্ষক-শিক্ষিকা সত্যিসত্যিই তার ক্লাসে ভেলকি দেখাতে পারেন। এটা কৌতূহল জিইয়ে রাখা, প্রশ্ন করার পারগতা, সমস্যা আসানে নাছোড় প্রচেষ্টা, সহ নাগরিকদের শ্রমসাধ্য উদ্যোগকে তারিফ, সমস্যা কিনারার উদ্ভাবনমূলক প্রচেষ্টা এবং সাধারণভাবে পড়ুয়াদের যুবা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ হিসেবে অংশগ্রহণ, পুরনো মাসিকতার সংশয়ে না ভোগা তাদের তাজা ধ্যানধারণার প্রেক্ষাপট নিয়ে আসার ক্ষমতা ধরে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তার বিষয়বস্তু দিয়ে শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক ও পড়ুয়ার উপকার করতে পারে, পঠনপাঠন পদ্ধতি প্রভাবিত করতে পারে, পারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুসন্ধানের এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে। আমাদের চারপাশে প্রাপ্তব্য বহু ধরনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রয়োগ পারস্পরিক ক্রিয়া এবং অন্বেষণে অসীম সম্ভাবনা জোগাতে পারে।

বিশ্বের দিকে মুখ করা এই জানলার মদত পাওয়া ছাত্র, আরও গভীরভাবে শেখার দিকে অনুপ্রাণিত হবে। তার সামনে থাকবে বৃত্তি বা পেশা বেছে নেওয়ার বহু বিকল্প। আরও প্রত্যয়, আরও দৃঢ় প্রচেষ্টা নিয়ে সমস্যার মোকাবিলায় সে হবে সুবিন্যস্ত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার কাছে থাকতে পারে এক নাগরিকের প্রগতির চাবিকাঠি, যে নাগরিক কিনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মগ্ন হয়ে জীবন কাটাতে হবে বেশি মানানসই।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক NCERT-এর 'Central Institute of Educational Technology'-র প্রধান। ইমেল : rajaramsharma@gmail.com)

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

ইন্টারভিউ ঃ WBCS - 2015 গ্রুপ - C / D

ডব্লুবিসিএস যেন সাপ - লুডোর খেলা। ইন্টারভিউ হল ৯৯ ঘরের সেই বড় সাপটি। আটকে আতিক্রম করতে না পারলে আবার শূন্য থেকে শুরু - তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের সলিল সমাধি।

ইতিমধ্যে ডব্লু বিসিএস -২০১৫ গ্রুপ A ও B এর ইন্টারভিউ নেওয়া সম্পন্ন হয়েছে। গ্রুপ A /B এর বোর্ড ছিল বেশ কর্ডিয়াল। কথোপকথন হয়েছে বাংলা ও ইংরাজী মিশিয়ে। গ্রুপ C এবং গ্রুপ D এর ইন্টারভিউ কেমন হবে? আভাস পেতে হলে যোগাযোগ করতেই হবে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষ এবং কুশলী বিশেষজ্ঞদের সাথে। মনে রাখবেন ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ জীবনে বার বার আসবে না। যারা ইংরাজীতে কথাবার্তায় সাবলীল নন তারা রিস্ক বা টেনশন না নিয়ে সাফল্যের দায়িত্ব নির্দ্বিধায় আমাদের হাতে অর্পণ করতে পারেন।

আপনি কি জানতে চান??

■ এ বছর বায়োডাটা থেকে কি কি প্রশ্ন করা হচ্ছে? ■ এ বারের ইন্টারভিউ বোর্ড কেমন-ফ্রেন্ডলি না স্ট্রেসফুল? ■ বাংলায় উত্তর দিতে দেওয়া হচ্ছে কি না? ■ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে কি ধরনের প্রশ্ন করা হচ্ছে? ■ গ্র্যাজুয়েশন বা অপশনাল থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে কি না? ■ হবি থেকে কোনও প্রশ্ন করা হচ্ছে কি না? ■ কাজের অভিজ্ঞতা থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে কি না? ■ বোর্ড, প্রার্থীর কাছ থেকে কি ধরনের উত্তর আশা করছে!

অ্যাকাডেমিকের ইন্টারভিউ ক্লাস সম্পর্কে টপারদের মতামত

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসটি সমুদ্রের মত। এই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি পড়ব এবং কতটা পড়ব এই বিষয়টি জানা। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এখানে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এখানকার স্যারদের পরামর্শে বিষয়টি হয়ে উঠেছে জলবৎ

সৌভিক ঘোষ
Executive (Rank-1), WBCS - 2015

ACADEMIC's hand of co-operation helped me to achieve the ultimate goal.

This long journey was quite difficult without the help of Academic Association which is the pioneer Institution for many WBCS aspirants like me. Their valuable study materials, Mock Interview classes, guidance and hand of Co-operation helped me to overcome the hurdles & to achieve the ultimate goal.

Moumita Sengupta, CTO (Rank-1), WBCS - 2015

টপ র‍্যাঙ্ক অফিসারদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি এই প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য চাই পরিশ্রম, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য। আমার সাফল্যের পথে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য অনস্বীকার্য। এখানকার মক ইন্টারভিউ আমাকে সাহায্য করেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সামিম সরকারের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহ দান আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরী করেছে। অ্যাকাডেমিকের গ্রুমিংসেশনগুলো এক কথায় অভূতপূর্ব।

সৌগত চৌধুরী, (Executive) WBCS-2015

I am very thankful to Academic Association for guiding me to overcome the fear regarding the interview.

First thing first, I owe my success to Almighty God and my parents to give their support, a positive environment and also have faith in me. To crack WBCS the most important thing is to know about the trend and changing pattern of exam.

Md. Jawed, ADSR (Gr.A), WBCS-2015

সামিম স্যারের বিশেষ ট্রেনিং–এ আমার এই সাফল্য

ইন্টারভিউ - এ সফল হওয়ার জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এর মক ইন্টারভিউ এবং গ্রুমিং ক্লাস অত্যন্ত ফলদায়ক। এখানে অভিজ্ঞ টিচার দ্বারা যে ভাবে ইন্টারভিউ ক্লাস নেওয়া হয় তা এককথায় অনবদ্য । আমার মতো ইন্টারভিউ এর সম্পর্কে যারা ভীত তাদের কাছে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন হল আদর্শ স্থান।

Habibur Rahaman, Excise Service, (Gr-A) WBCS - 2015

অনেক অভিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ, ডিএসপি, সিটিও – স্যারদের ক্লাস থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নিজের কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক বেড়ে যায়

Gr.A & B তে ডাক পেয়ে সময় নষ্ট না করে অ্যাকাডেমিক অ্যাসেসিয়েশন - এর ইন্টারভিউ কোচিং - এ অ্যাডমিশন নিই। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে আজ আমি সাফল্য পেয়েছি।

Humayun Chowdhury, (Executive) WBCS- 2015

Academic Association ✆ 9038786000
H.O. : The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073 ✆ 9674478644

Website : www.academicassociation.in ■ Centre: Uluberia-9051392240 ✸Barasat-9800946498 ✸Berhampur-9474582569
✸Birati-9674447451 ✸ Medinipur-9474736230 ✸Darjeeling-9832041123 ✸Siliguri-9474764635

কলম্বিয়ায় যুদ্ধ শান্তি, হয়তো

*গত পাঁচ দশকে কলম্বিয়ায় অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা রাজনৈতিক অস্থিরতার যে আবহ গড়ে উঠেছে (যা কলম্বিয়ার অর্থনৈতিক প্রগতির পথ অনেকটাই অবরুদ্ধ করে রেখেছিল) তা সম্ভবত দূর হতে চলেছে। কতকটা শান্তির নিছক সম্ভাবনাতেই রাষ্ট্রপতি হুয়ান মানুয়েল সান্তসকে এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ একাধিক বার সমস্যা দূর হবার উপক্রম হবার পরেও শেষ অবধি সমাধান অধরাই থেকে গিয়েছিল—তাই সংগ্রামের অবসান হবার আশা অনেকেই প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু কিছু পর্যবেক্ষকের মতে কলম্বিয়ার এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আর্থ-সামাজিক শিকড় এতটাই গভীরে যে FARC অস্ত্র সংবরণ করলেই অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী এই সংগ্রামের অবসান হয়ে গেল তা মনে করার সময় এখনও আসেনি। তাই কলম্বিয়ার এই শান্তি চুক্তির তাৎপর্য বুঝতে গেলে তার আগের পাঁচ দশকের সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতটাও বুঝতে হবে। লিখেছেন—***ড. কিংশুক চট্টোপাধ্যায়**

সেপ্টেম্বর, ২০১৬-এ কলম্বিয়ার সরকার এবং সেদেশের বামপন্থী Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এর সঙ্গেই প্রায় অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী এমন এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটতে চলেছে যা ১৯৫৮-২০১৩ সময়কালে ২,২০,০০০-এরও বেশি মৃত্যু এবং পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি লোকের বাস্তুচ্যুত হবার কারণ। গত অক্টোবর মাসেই এই চুক্তি একটি গণভোটে প্রত্যাখ্যাত হলেও নভেম্বর মাসে আরেকটি পরিমার্জিত চুক্তির মাধ্যমে কলম্বিয়ার সরকার এবং FARC শান্তির পথে অবিচল থাকার বিষয় তাদের প্রত্যয়ের কথা জানিয়ে দেয়। নিঃসন্দেহে এই চুক্তিপর্ব কলম্বিয়ার ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ বলে সাব্যস্ত হবে, কারণ গত পাঁচ দশকে কলম্বিয়ায় অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা রাজনৈতিক অস্থিরতার যে আবহ গড়ে উঠেছে (যা কলম্বিয়ার অর্থনৈতিক প্রগতির পথ অনেকটাই অবরুদ্ধ করে রেখেছিল) তা সম্ভবত দূর হতে চলেছে। কতকটা শান্তির নিছক সম্ভাবনাতেই রাষ্ট্রপতি হুয়ান মানুয়েল সান্তসকে এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ একাধিক বার সমস্যা দূর হবার উপক্রম হবার পরেও শেষ অবধি সমাধান অধরাই থেকে গিয়েছিল—তাই সংগ্রামের অবসান হবার আশা অনেকেই প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু কিছু পর্যবেক্ষকের মতে কলম্বিয়ার এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আর্থ-সামাজিক শিকড় এতটাই গভীরে যে FARC অস্ত্র সংবরণ করলেই অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী এই সংগ্রামের অবসান হয়ে গেল তা মনে করার সময় এখনও আসেনি। তাই কলম্বিয়ার এই শান্তি চুক্তির তাৎপর্য বুঝতে গেলে তার আগের পাঁচ দশকের সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতটাও বুঝতে হবে।

পাঁচ দশক ধরে চলতে থাকা কলম্বিয়ার এই সংঘর্ষের প্রধান কুশীলবেরা ছিল সেদেশের সরকার, দক্ষিণপন্থী আধাসামরিক বাহিনীসমূহ এবং বামপন্থী FARC তথা ELN (National Salvation Army)। প্রকৃতপক্ষে এই সংঘাতের সূত্রপাত হয় ১৯২০-র দশকে সুমাপাজ (Sumapaz) এবং তেকুয়েন্দামা (Tequendama) অঞ্চলের কৃষি বিক্ষোভের সূত্র ধরে। প্রধানত কফির চাষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা খামারের ওপরে ভূস্বামী এবং কৃষকদের নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ে কলম্বিয়ার দুই প্রধান রাজনৈতিক দল—রক্ষণশীল এবং উদারপন্থী—জড়িয়ে পড়ে। দু' পক্ষই রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাবার ফলে তাদের নিজস্ব অবস্থানে অনমনীয় হয়ে যায়, ফলে সমস্যার কোনও সহজ সমাধান অমিল সাব্যস্ত হয়েছিল। এতে কলম্বিয়ার রাজনৈতিক বাতাবরণে যে সামগ্রিক তিক্ততা দেখা দেয় তা যুদ্ধোত্তর যুগে শীতযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আরও বিষময় হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণপন্থী শক্তির হাতে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী জনপ্রিয় বামপন্থী নেতা Jorge Eliecer Gaitan নিহত হলে রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসে এবং উদারপন্থীদের সমর্থক কৃষকদের জমি দখল করতে উৎসাহিত করে। জমিকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই বিবাদে রক্ষণশীল এবং উদারপন্থী উভয় দলই নিজস্ব আধাসামরিক বাহিনী [যা পরবর্তীকালে বান্দলেরো (Bandolero) বলে পরিচিত হয়েছিল] মোতায়েন করতে শুরু করে এবং কলম্বিয়া La Violencia নামে প্রায় এক দশকব্যাপী (১৯৪৮-'৫৮) এক গৃহযুদ্ধের শিকার হয়।

La Violencia-র পরিণামে গৃহযুদ্ধের অন্যতম শিকার কলম্বিয়ার গ্রামবাসীদের মধ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক চেতনা আরও কায়েম হয়ে বসে। শীতযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান মহাদেশে বামপন্থার উত্থান রুখতে বদ্ধপরিকর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়ায় রাজনৈতিক স্থিরতা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয় এবং রক্ষণশীল ও উদারপন্থী রাজনীতিবিদদের একত্রে এনে জাতীয় সরকার নামক একটি কাঠামোয় উভয় পক্ষকেই ক্ষমতা

ভোগের ব্যবস্থা করে দেয়। এর পরেই কলম্বিয়ায় মার্কিন মদতপুষ্ট এক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়। যার ফলস্বরূপ প্রায় চার লক্ষ লোককে কৃষিজমি থেকে উৎখাত করা হয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া হলে ক্ষমতাসীন দক্ষিণপন্থী সরকার মার্কিন মদতে ১৯৬০-এর দশকে যে প্রবল দমন নীতি অবলম্বন করে, তারই প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় সরকারের কাঠামোর বাইরে থাকা উদারপন্থী এবং কমিউনিস্ট আধাসামরিক বাহিনীগুলি মিলিত হয়ে দু'টি প্রধান বামপন্থী গোষ্ঠীর জন্ম দেয়—জঙ্গি কমিউনিস্ট এবং কৃষক আত্মরক্ষা বাহিনীগুলি মিলে FARC-এর গঠন করে এবং বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এবং ক্যাথলিক চরমপন্থীরা মিলে গঠন করে ELN। বামপন্থী এই গেরিলা সংগঠনগুলির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে কলম্বিয়ার ভূস্বামী শ্রেণি United Self-Defence Forces of Colombia (AUC)-র গঠন করে, যা ২০০৬ সাল অবধি পুরোদস্তুর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। এই সংগঠনের সদস্যরা ২০০৬-এ AUC ভেঙে দেবার পরেও Bacrim (গুণ্ডাবাহিনী) হিসাবে তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছিল।

১৯৭০-এর দশকে FARC কলম্বিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে তাদের ঘাঁটির বাইরে বিশেষ সাফল্য না পেলেও ELN ইত্যাদি কিছু শহুরে উগ্র বামপন্থী গোষ্ঠী যে সংঘর্ষ চালায় তাতে কলম্বিয়ার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল। ১৯৮০-র দশকে সেদেশের সরকার একটি শান্তি-প্রক্রিয়ায় FARC-সহ সবক'টি চরমপন্থী গোষ্ঠীকেই সামিল করতে চেষ্টা করে, যার সূত্রে সৃষ্টি হয় Patriotic Union (UP) নামক একটি মূলত বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন। UP-র আড়ালে FARC তথা অন্যান্য বামপন্থী রাজনীতির জনপ্রিয়তা কলম্বিয়ার উদারপন্থী এবং রক্ষণশীলদের আশঙ্কিত করে তোলে—এক সময় এরা ২৩-টি পুরসভা দখল করে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১৪ জন নির্বাচিত সদস্য পাঠাতে সক্ষম হয়। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতালাভের লক্ষ্য থেকে FARC তখনও সরার কথা ভাবতে রাজি ছিল না। ফলে ১৯৮৭ সালে তারা একটি সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমণ চালালে ভঙ্গুর শান্তি-প্রক্রিয়া ভেঙে পড়ে এবং UP-র রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সমেত দু'-হাজারেরও বেশি FARC সদস্য সামরিক এবং আধা-সামরিক বাহিনীর আক্রমণে প্রাণ হারায়।

FARC প্রমুখ বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির রমরমা শুরু হয় মূলত ১৯৯০-এর দশক থেকে। ১৯৮০-র দশকে কলম্বিয়ার মাদক ব্যবসা এক বিশাল পরিমাণ অর্থের উৎস হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছিল এবং FARC প্রমুখ বামপন্থী গেরিলা সংগঠনগুলি মাদক ব্যবসায়ী এবং তাদের পরিবারকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করে থাকত। ফলে ১৯৮০-র দশকের শেষ দিক থেকেই মাদক ব্যবসায়ীরা দক্ষিণপন্থী আধাসামরিক বাহিনীগুলিকে মদত করতে শুরু করে। এর সঙ্গে যুঝে উঠতে FARC ইত্যাদি বামপন্থী গেরিলা দলগুলিও মাদক ব্যবসায় হাত লাগায় এবং তাদের প্রভাবাধীন এলাকাগুলিতে কোকেন-এর উৎস কোকার চাষে উৎসাহ দেয়। ফলে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির সমর্থক মাদক ব্যবসায়ী চক্রের সঙ্গে FARC ইত্যাদি বামপন্থী গেরিলা সংগঠনগুলির মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রত্যক্ষ সংঘাত আরও বাড়তে থাকে এবং কলম্বিয়া কার্যত এক রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। পাশাপাশি দক্ষিণপন্থী ব্যবসায়ী, ভূস্বামী, রাজনীতিবিদ এবং মাদক ব্যবসায়ীদের ওপরে আক্রমণ, যত্রতত্র অপহরণ ইত্যাদির সুবাদে FARC ইত্যাদি বামপন্থী গেরিলা দলগুলি প্রতাপশালী হিসাবে সাব্যস্ত হয়। একটা হিসাব অনুসারে ১৯৭০-২০১০ সময়কালে প্রায় ২৫,০০০ অপহরণের পিছনে এই গেরিলা সংগঠনগুলির হাত রয়েছে বলে মনে করা হয়।

১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে কলম্বিয়া থেকে রপ্তানি করা কোকেন এবং অন্যান্য মাদক বিশ্বজনীন সরবরাহের একটি বড়ো অংশ হিসাবে প্রতিভাত হয়। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০০ সাল নাগাদ বিশ্বের মোট কোকেন-এর ৯০ শতাংশই আসত কলম্বিয়া থেকে এবং ২০০৯ সালে মার্কিন পরিসংখ্যান বলছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা মোট কোকেনের দুই-তৃতীয়াংশই আসছিল FARC নিয়ন্ত্রণাধীন কলম্বিয়া থেকে। মাদক ব্যবসা থেকে FARC ঠিক কতটা রোজগার করে থাকে সেই বিষয়ে কোনও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি (২০০ মিলিয়ন ডলার থেকে সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার দু'টি অনুমানই ক্ষেত্র বিশেষে উল্লেখিত হয়েছে), তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, মাদক ব্যবসা FARC-এর জন্য বিশেষ লাভজনক সাব্যস্ত হয়েছে। এই ব্যবসা থেকে হওয়া লাভের সুবাদে FARC (এবং পরবর্তীকালে ELN) কলম্বিয়ার দরিদ্র জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াতে সফল হয়েছিল। ফলে বাস্তুচ্যুত দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে FARC-এর ছত্রচ্ছায়ায় আসার প্রবণতাও ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। কোকার চাষ করে কৃষকদের আর্থিক সমস্যা বহুলাংশে দূর হওয়াতে FARC-এর প্রভাবও নিরন্তর বাড়তে থাকে।

কলম্বিয়ার মাদক ব্যবসার বৃহত্তম শিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০০ সাল নাগাদ Plan Columbia নামে একটি প্রকল্প চালু করে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল কলম্বিয়ায় গেরিলা প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়ে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে মজবুত করে মাদক ব্যবসার ওপরে একটি মারণ আক্রমণ হানা। সেই প্রকল্প অনুসারে ওয়াশিংটন তার পরের দেড় দশকে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। মূলত সেই অর্থ সাহায্যের সুবাদে ২০০২ সালে রাষ্ট্রপতি আল্‌ভারো উরিবে দক্ষিণ এবং বামপন্থী—উভয় ধরনের গেরিলাদের বিরুদ্ধেই কড়া অবস্থান নিয়েছিলেন। যদিও উরিবের সমালোচকেরা মনে করেন যে তিনি দক্ষিণপন্থী গেরিলাদের প্রতি কতকটা সদয়ই ছিলেন। উরিবে আধাসামরিক বাহিনীগুলিকে ভেঙে দিতে তাদের মার্জনা করে আইন পাস করেন। ২০০৬ সালের মধ্যেই দক্ষিণপন্থী আধাসামরিক বাহিনীর ৩১,০০০-এরও বেশি সদস্যে অস্ত্র সংবরণ করে (কিন্তু তাদের অস্ত্র বিসর্জন দেবার ওপরে জোর দেওয়া হয়নি)। বামপন্থী দলগুলি, প্রধানত FARC এই ডাকে সাড়া না দেওয়াতে এর পরে উরিবে পূর্ণ শক্তিতে FARC এবং ELN-এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেন। প্রবল এই সামরিক অভিযানের ফলে FARC

এবং ELN-এর সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৪১,০০০-এর বেশি (২০০১) থেকে ১৮,০০০-এর কমে (২০১৬) এবং ৫,০০০ থেকে প্রায় ২,০০০-এ এসে দাঁড়িয়েছে। আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হল, কলম্বিয়ার এমন কিছু এলাকা যেখানে কেন্দ্রীয় শাসন প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে আবার সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা সম্ভব হয়। বস্তুত কিছু পর্যবেক্ষকের মতে, FARC-এর সামরিক শক্তি এতটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছে, যে তারা আলোচনার পথে হাঁটতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছে।

মানতেই হবে ২০১৬-র নভেম্বর মাসে কলম্বিয়ার সরকার এবং FARC-এর মধ্যে সম্পন্ন চুক্তি সে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার দিশায় সব থেকে সম্ভাবনাময় পদক্ষেপ। পর্যবেক্ষকদের মতে, রাষ্ট্রপতি উরিবের শাসনকালে (২০০২-'১০) FARC-কে দুর্বল করে দেওয়া সম্ভব হলেও, FARC এতটা দুর্বল হয়নি যে সামরিকভাবে তারা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপতি উরিবের বাবার মৃত্যু হয়েছিল FARC-এর হাতে, ফলে তার পক্ষে FARC-এর সঙ্গে শান্তি-মীমাংসা করার সম্ভাবনাও বিশেষ ছিল বলে অনেকেই মনে করেননি। বরং উরিবের আমলে তার সামরিক নীতির প্রধান রূপকার, তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি (২০১০ থেকে এখন অবধি) হুয়ান মানুয়েল সান্তসের পক্ষে একপ্রকার বিজয়ী বীর হিসাবে FARC-এর দিকে আলোচনার হাত বাড়িয়ে দেওয়াটাই যুগপৎ সহজ এবং কার্যকর সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রায় তিন বছর ধরে বলিভিয়ার উগো শাভেজ এবং কিউবার রাওল কাস্ত্রোর মধ্যস্থতায় আলোচনা চলার পরে ২৪ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে হাভানায় রাষ্ট্রপতি সান্তস এবং FARC-নেতা রদ্রিগো লন্ডিনিয় ওরফে টিমোশেঙ্কো যে চুক্তিতে হস্তাক্ষর করে তাতে স্থির হয় যে FARC-এর সশস্ত্র বাহিনীর ১৭,০০০ সদস্যের প্রত্যেকেই রাষ্ট্রসংঘের তদারকিতে ২৩-টি নির্দিষ্ট এলাকায় অস্ত্র সংবরণ করবে। FARC-এর গেরিলাবাহিনী কলম্বিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে মাইন পেতে রেখেছে তা তারা সরিয়ে নেবে এবং কোকার চাষ এবং কোকেন উৎপাদন থেকে সরে দাঁড়াবে। বিনিময়ে কলম্বিয়ার সরকার FARC-এর অধীনে থাকা এলাকাগুলির উন্নয়নে বহু বিলিয়ন ডলার পুঁজিনিবেশ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে এবং FARC-এর সদস্যদের কলম্বিয়ার মূলস্রোতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে।

শুধু একটি সমাধান বহু কলম্বিয়াবাসীর পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টকর সাব্যস্ত হয়েছে। FARC-এর নেতারা চাইছিল যে সহস্রাধিক মৃত্যুর কারণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের গেরিলা নেতাদের কোনও বিচার বা শাস্তি দেওয়া চলবে না। পক্ষান্তরে কলম্বিয়ার সরকার চাইছিল এদের পুরোদস্তুর বিচার হোক, না হলে FARC-এর অত্যাচারের শিকার কলম্বিয়ার নাগরিকদের চোখে এই চুক্তির কোনও গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। ২৬ সেপ্টেম্বরের করতাজেনা চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, FARC নেতৃবর্গ একটি বিশেষ আদালতের সামনে দাঁড়াবেন এবং সেখানে সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি না করলে তাদের হাজতবাস অবধারিত; পক্ষান্তরে দোষ স্বীকার করলে কিছুদিন তাদের গতিবিধির ওপরে বিধিনিষেধ বজায় রাখা হবে, তার পরে তারা স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারবে। কিন্তু কলম্বিয়ার নাগরিকদের একটি বড়ো অংশের মনে হয় যে এটা FARC-এর পীড়নের শিকার মানুষজনকে একপ্রকার অপমান করারই সামিল। তাই ২ অক্টোবরের গণভোটে ৫০ শতাংশের থেকে সামান্য বেশি ভোটে এই শান্তি চুক্তি খারিজ হয়ে যায়।

আশার কথা হল যে এর পরেও কলম্বিয়ার সরকার এবং FARC শান্তির পথে অবিচল থাকতে বদ্ধপরিকর রয়েছে। গণভোটে শান্তি চুক্তি খারিজ হবার পরে তারা আবার আলোচনায় বসে এবং এই চুক্তির মূল সমালোচক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি উরিবের আপত্তিকে মর্যাদা দিয়ে ৫০০-টি আলাদা খুঁটিনাটি পরিবর্তন প্রস্তাব করে, যার প্রায় সব ক'টিই FARC মেনে নিয়েছে। এই পরিমার্জিত চুক্তি অনুসারে FARC-এর সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ (যা এখনও অবধি অঘোষিত রয়েছে) তাদের হিংসার শিকার মানুষজনের ক্ষতিপূরণের কাজে ব্যবহার করা হবে এবং গেরিলা নেতৃবর্গ তাদের দোষ স্বীকার করলে তাদের গতিবিধির ওপর বিধি-নিষেধের মাত্রা আগের থেকে অনেকটা বেশি রাখা হবে, যাতে তারা অদূর ভবিষ্যতে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে না পারে। কেবল অস্ত্র সংবরণের পরেও জনজীবনে FARC-কে সামিল হতে না দেবার যে দাবি আল্‌ভারো উরিবে রেখেছিলেন তা রাষ্ট্রপতি সান্তস খারিজ করে দিয়েছেন এই বলে যে, তাতে FARC-এর শান্তি চুক্তিতে আগ্রহ কমে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে দেখার বিষয় হল রাষ্ট্রপতি সান্তস তার এই শান্তি প্রয়াসে সিলমোহর লাগাতে আবার গণভোটের আশ্রয় নেবেন, নাকি এই চুক্তি তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় নিয়ে গিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেবেন, যেখানে তার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। ডিসেম্বর মাসে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে যাবার আগে সেই অনুমোদন হুয়ান মানুয়েল সান্তস পেয়ে গেলে ভালো, কারণ FARC-এর সঙ্গে শান্তির বিরোধীরা চুক্তির অনুমোদন ঠেকাতে পারলে FARC (এবং ELN, যাদের সঙ্গে কলম্বিয়ার সরকার বর্তমানে আলোচনারত) যে শান্তির পথ থেকে আবার দূরে সরে যাবে না, সেই নিশ্চয়তা নেই।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও ইনস্টিটিউট অফ ফরেন পলিসি স্টাডিজ-এ অতিথি শিক্ষক। আমেরিকান সেন্টার-এর ফরেন পলিসি স্টাডি সার্কেল-এর বর্তমান সেক্রেটারি। ইমেল : kchat18@gmail.com)

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : ভারতীয় টাকা

১. ভারতীয় টাকার ISO code কী?

২. ভারতীয় টাকার '₹' চিহ্ন-যুক্ত কয়েন প্রথম কবে চালু করা হয়?

৩. সরকারিভাবে ভারতীয় টাকা ছাপায় কোন সংস্থা?

৪. ভারতীয় টাকার চিহ্ন '₹'-এর নক্‌শা কে প্রস্তুত করেন?

৫. ব্রিটিশ শাসনকালে এক টাকা কত আনার সমান ছিল?

৬. টাকাকে কবে ১০০ পয়সায় ভাগ করা হয়?

৭. ষাটের দশকে ভারত সরকার বিদেশে ব্যবহার করার জন্য বিকল্প হিসেবে কোন মুদ্রা চালু করে?

৮. বর্তমানে কোন দেশের মুদ্রা ভারতীয় টাকার সমতুল্য?

৯. ২০১৪ সালে কোন দেশ ভারতীয় টাকাকে তাদের ভূ-খণ্ডে ব্যবহারের জন্য আইনত স্বীকৃতি দেয়?

১০. ভারতীয় নোটে ক'টি আঞ্চলিক ভাষায় টাকার অঙ্কটি লেখা থাকে?

১১. ভারতীয় টাকার চিহ্ন '₹'-এর উৎস কোন লিপি?

১২. কোন আমলে ভারতে প্রথম 'কাগজের মুদ্রা' বা Paper Currency-র ব্যবহার শুরু হয়?

১৩. ভারতে প্রচলিত কোন নোট রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ছাপায় না?

১৪. এখনও পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সর্বোচ্চ মূল্যের মুদ্রা কোনটি?

১৫. বর্তমানে এ দেশে যে নোট প্রচলিত, তার নাম Mahatma Gandhi (MG) Series Notes। সর্বপ্রথম কবে এর প্রচলন শুরু হয়?

উত্তর :

১. INR। ২. ৮ জুলাই, ২০১১। ৩. রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। ৪. উদয় কুমার ধর্মলিঙ্গম। ৫. ১৬ আনা। ৬. ১৯৫৭ সালে। ৭. Gulf rupee বা Persian Gulf rupee। [আরব ও পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলিতে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৬-এ ব্যবহার করার জন্য ভারত সরকার/রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Gulf rupee বা Persian Gulf rupee নামক মুদ্রা বের করে, যা ভারতীয় টাকার সমতুল্য ছিল।] ৮. ভুটান (নাল্ট্রাম)। ৯. জিম্বাবোয়ে। ১০. ১৫-টি ভাষায়। ১১. দেবনাগরী। ১২. ব্রিটিশ আমলে। ১৩. এক টাকার নোট (এটি ছাপায় কেন্দ্রীয় বিত্ত মন্ত্রক)। ১৪. দশ হাজার টাকার নোট। [১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এক হাজার ও দশ হাজার টাকার নোট প্রচলিত ছিল এ দেশে। ১৯৫৪ সালে এক হাজার, পাঁচ হাজার ও দশ হাজার টাকার নতুন নোট চালু করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সালে সেগুলি বাতিল করা হয়।] ১৫. ১৯৯৬ সালে। [পরবর্তীকালে ২০০৫ সালে সেগুলির পরিবর্তে এই একই সিরিজের নতুন নোট বাজারে ছাড়া হয়।]❑

যোজনা ||| নোটবুক

এবারের বিষয় : শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার

ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্মানীয় পুরস্কার শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার। প্রতি বছর 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' (Council of Scientific and Industrial Research—CSIR) ভারত সরকারের তরফে এই পুরস্কার প্রদান করে। জীবনবিজ্ঞান; রসায়ন বিজ্ঞান; পৃথিবী, আবহাওয়া, সমুদ্র এবং গ্রহবিষয়ক বিজ্ঞান; ইঞ্জিনিয়ারিং; গণিত; চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে অসামান্য মৌলিক বা ফলিত গবেষণাকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ এই সম্মান। CSIR-এর প্রতিষ্ঠাতা-অধিকর্তা শান্তি স্বরূপ ভাটনগরের নামাঙ্কিত এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে আসছে ১৯৫৮ সাল থেকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তরুণ ভারতীয় গবেষকদের কাজকে স্বীকৃতি জানাতে প্রতি বছর ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এবছরও ওই দিনটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রক প্রথামতো উল্লিখিত সাতটি ক্ষেত্রে ১১ জন পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণা করে।

এ বছরের শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার আমাদের বাঙালিদের কাছে আর একটি কারণেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দু'জন বাঙালি, CSIR-এর আওতাধীন 'Indian Institute of Chemical Biology', কলকাতার বিজ্ঞানী শুভেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জীবনবিজ্ঞান বিভাগে এবং রসায়ন বিজ্ঞানে বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক 'Indian Institute of Science'-এর 'অজৈব ও ভৌত রসায়ন বিভাগ'-এর ড. পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়—এ বছর শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পান।

জীবকোষের মধ্যে থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদান। তারই হাতে জিনের কাজ নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি। 'মাইক্রো আরএনএ' নামে এমন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ঠিকুজি-কোষ্ঠী অবশ্য বিজ্ঞানীরাও এখনও জেনে উঠতে পারেননি। তবে দেশ-বিদেশে চেষ্টা চলছে। এ শহরের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানও রহস্য ভেদের শরিক হয়।

জীব কোষের রহস্য ভেদের চেষ্টা করে চলেছেন 'Indian Institute of Chemical Biology' (IICB)-র বিজ্ঞানী শুভেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সেই কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১৭ বছর পর জীবনবিজ্ঞানে শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার উঠেছে কোনও বাঙালি বিজ্ঞানীর হাতে। এর আগে পেয়েছিলেন বোস ইনস্টিটিউটের বর্তমান অধিকর্তা সিদ্ধার্থ রায়।

প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রাক্তনী শুভেন্দ্রনাথ দেশের মাটিতে বসে গবেষণা করার জন্য সুইৎজারল্যান্ড থেকে ফিরে IICB-তে যোগদান করেন। ২০০৮ সাল থেকে শুরু করেন মাইক্রো আরএনএ-র চরিত্র অনুসন্ধান। সে সময় IICB-র অধিকর্তা ছিলেন ভাটনগর পুরস্কারের ক্ষেত্রে শুভেন্দ্রনাথের পূর্বসূরি সিদ্ধার্থ রায়ই।

ডায়াবেটিস থেকে ক্যানসার, মানব শরীরের নানা ধরনের রোগের পিছনেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জিনই দায়ি এবং সেই জিনের কাজের নিয়ন্ত্রক হিসেবে জুড়ে রয়েছে এক বা একাধিক মাইক্রো আরএনএ (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড)। এই ক্ষুদ্র আরএনএ তার নিজস্ব আদান-প্রদান পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমাদের শরীরের কোষ থেকে কোষে সঙ্কেত বয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার গতিপ্রকৃতি বিজ্ঞানীদের সম্পূর্ণ অজানা। সেই অজানাকে জানতে পারলেই অবশ্য দিশা মিলতে পারে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন দিকের। মাইক্রো আরএনএ-র ঠিকুজি এবং চরিত্র বোঝা গেলে ডায়াবেটিস, ক্যান্সারের মতো রোগের চিকিৎসার নতুন দিক খুলে যেতে পারে।

জীববিজ্ঞান বিভাগে শুভেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছাড়াও বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক 'Indian Institute of Science (IISc)-র আণবিক জীব পদার্থবিদ্যা ইউনিটের ঋষিকেশ নারায়ণনও পুরস্কার পেয়েছেন।

পৃথিবী, আবহাওয়া, সমুদ্র এবং গ্রহবিষয়ক বিজ্ঞান বিভাগে আমেদাবাদস্থিত 'Physical Research Laboratory'-র ভূ-বিজ্ঞান বিভাগের ড. সুনীল কুমার সিং পুরস্কার পান।

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রাপকের সংখ্যা দুই। কানপুর IIT-র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ড. অবিনাশ কুমার আগরওয়াল এবং বেঙ্গালুরুস্থিত 'Microsoft Research India'-র ভেঙ্কট নারায়ণ পদ্মনাভন।

যোজনা ||| নোটবুক

গণিত বিভাগেও পুরস্কার পেয়েছেন দু'জন। মুম্বাই-ভিত্তিক 'Tata Institute of Fundamental Research'-এর 'School of Mathematics'-এর ড. অমলেন্দু কৃষ্ণ এবং IIT, দিল্লির কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নবীন গর্গ।

পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রাপকের সংখ্যা দু'জন। কানপুর IIT-র পদার্থবিদ্যা বিভাগের ড. সুব্রাহ্মনিয়াম অনন্ত রাধাকৃষ্ণণ এবং বেঙ্গালুরুস্থিত 'Indian Institute of Science'-এর 'Centre for High Energy Physics'-এর ড. সুধীর কুমার ভেম্পটি।

ভাটনগর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপক ও অন্যান্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

চিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Department of Biotechnology and Bioinformatics' বিভাগের ড. নিয়াজ আহমেদ এ এস।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে গবেষণা কর্মে অসামান্য অবদান রেখেছেন এমন যে কোনও ভারতীয় বিজ্ঞানী-গবেষক, যার বয়স ৪৫ বছরের মধ্যে এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হন। পুরস্কারের জন্য মনোনীত হওয়ার আগে পাঁচ বছর ধরে ভারতে বসে গবেষণা কর্মে অবদানের ভিত্তিতেই প্রাপকদের নাম নির্বাচন করা হয়। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও পুরস্কার প্রাপকরা তাদের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে ১৫ হাজার টাকা করে পাবেন। উল্লেখ, ২০০৮ সাল পর্যন্ত এই পুরস্কার মূল্য ছিল ২ লক্ষ টাকা। ২০০৯ সাল থেকে তা বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়।

মনোনয়নের জন্য নাম প্রস্তাব করেন CSIR-এর পরিচালকবর্গের কোনও সদস্য, কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, জাতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ডিন ছাড়াও প্রাক্তন পুরস্কার প্রাপকগণ।

প্রত্যেক বছর পুরস্কার প্রাপকদের নাম নির্বাচনের জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য সংখ্যা অন্তত ছয় জন হতে হবে। যার মধ্যে একজন প্রাক্তন পুরস্কার প্রাপককে অবশ্যই রাখতে হবে। নাম নির্বাচনের জন্য অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সহমত হওয়া প্রয়োজন। যদি কোনও ক্ষেত্রে সমমেধার ভিত্তিতে দু'জন প্রাপকের নির্বাচনের বিষয়ে উপদেষ্টা কমিটি সহমত হয়,তবে দু'জনকেই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এ বছরটি হল CSIR-এর প্ল্যাটিনাম জুবিলী বছর। এই উপলক্ষে ১১ জন বিজ্ঞানী-গবেষককে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার দেওয়ার পাশাপাশি ৬ জন তরুণ বিজ্ঞানীকেও "CSIR—Young Scientist Award" দেওয়া হয়।❑

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(২২ অক্টোবর—২২ নভেম্বর, ২০১৬)

আন্তর্জাতিক

● **নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ডনাল্ড ট্রাম্প :**

দেশের ৫৮তম নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ডনাল্ড ট্রাম্প। সে দেশের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হতে পারলেন না হিলারি ক্লিন্টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টন নির্বাচন প্রক্রিয়ার একাধিক পর্যায় আছে। গত ৮ নভেম্বর মার্কিন ভোটদাতারা 'প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেক্টর' নির্বাচন করেন। আগামী ১৯ ডিসেম্বর এরাই নিজেদের নির্বাচন ক্ষেত্র অনুযায়ী ইলেক্টোরাল কলেজ-এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন চূড়ান্তভাবে। মিশিগান ব্যতীত বাকি ৪৯-টি রাজ্য থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত ২৯০-টি ইলেক্টোরাল কলেজ জিতেছেন ট্রাম্প আর হিলারি জিতেছেন ২৩২-টি। অন্তত ২৭০-টি ইলেক্টোরাল কলেজ জয় প্রয়োজনীয়। উল্লেখ্য, ট্রাম্প ও হিলারির 'রানিং মেট' যথাক্রমে ইন্ডিয়ানার গভর্নর মাইক পেন্স ও ভার্জিনিয়ার সেনেটর টিম ক্যেন। আশা করা হচ্ছে ২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারি ডনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হবেন। আর ৪৮তম মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবেন পেন্স।

তবে 'পপুলার ভোট'-এ ট্রাম্প পিছিয়ে। ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, হিলারি ক্লিন্টন পেয়েছেন ৬৩,৩৯০,৬৬৯-টি (প্রায় ৪৮ শতাংশ) ভোট আর ট্রাম্প ৬১,৮২০,৮৪৫-টি (প্রায় ৪৭ শতাংশ)—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তার নিরিখে দেড় মিলিয়ানেরও বেশি ভোটে এগিয়ে হিলারি ক্লিন্টন। ইতিহাসে এই পঞ্চমবার এমন বিরল ঘটনা ঘটল। এর আগে শুধুমাত্র ১৮২৪, ১৮৭৬, ১৮৮৮ ও ২০০০ সালে জয়ী প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থী 'পপুলার ভোট'-এ হেরে গেছেন। বস্তুত, কোনও প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট-এর আগে এত বেশি ভোটের ব্যবধানে 'পপুলার ভোট'-এ হারেননি কখনও।

● **রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার পরিষদ থেকে বাদ রাশিয়া :**

রাষ্ট্রপুঞ্জের যে শাখা গোটা বিশ্বে মানবাধিকার সুরক্ষিত রাখতে কাজ করে, সেই রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবাধিকার পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৪৭। রাশিয়া ২০০৬ সাল থেকে একটানা ২০১২ সাল পর্যন্ত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এসেছে। তার পর ২০১৩ সালে ফের রাশিয়া ৩ বছরের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবাধিকার পরিষদের সদস্য হয়। সেই মেয়াদ এ বছরই শেষ হল। রাশিয়া ছাড়াও আরও ১৩-টি দেশের মেয়াদও একই সঙ্গে শেষ হয়। সেই ১৪-টি শূন্য আসনের জন্য নতুন সদস্য বেছে নিতে ১৯৩-টি দেশ ২৮ অক্টোবর ভোটাভুটিতে অংশ নেয়। মস্কো ১১২-টি ভোট পায়। রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল হাঙ্গেরি এবং ক্রোয়েশিয়া। তারা রাশিয়ার চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবাধিকার পরিষদে নির্বাচিত হয়। উল্লেখ্য, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়ে রুশ সেনা প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বাহিনীকে সমর্থন করছে।

ভারতও ২০০৬ সাল থেকেই রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবাধিকার পরিষদের সদস্য। ২০১০ সাল পর্যন্ত একটানা ওই পরিষদের সদস্য ছিল ভারত। তার পর ২০১১-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৭ সালের জন্যও ভারত ফের নির্বাচিত হয়। অর্থাৎ, আগামী বছরের প্রায় শেষের দিক পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবাধিকার পরিষদের সদস্যপদে থাকছে। ৪৭ সদস্যের সংগঠনে প্রতি বছর এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি সদস্যপদ খালি হয়। ২০১৭ সালে ১৮-টি আসন খালি হবে এবং সেই সব আসনের জন্য নতুন সদস্যরা নির্বাচিত হবে। একইভাবে ২০১৮ সালে ১৫-টি আসনের জন্য নির্বাচন হবে।

● **১৮ বছর পর ভারতীয় রাষ্ট্রপতির নেপাল সফর :**

গত ২ নভেম্বর তিন দিনের নেপাল সফরে কাঠমাণ্ডু পৌঁছান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। বস্তুত ১৮ বছর পরে ভারতের কোনও রাষ্ট্রপতি নেপাল সফরে গেলেন। শেষ এসেছিলেন কে. আর. নারায়ণন, ১৯৯৮ সালে। অবশ্য, ২০০৮ সালে ভোটে জিতে পুষ্পকুমার দাহাল ওরফে "প্রচণ্ড" (মাওবাদী আন্দোলন থেকে রাজনীতির মূল স্রোতে এসে) প্রথম যখন নেপালের প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসেন, সে সময়ও ভারতের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে প্রণব মুখোপাধ্যায় কাঠমাণ্ডু যান।

এবারের সফরে প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রথম দিনেই নেপালের রাষ্ট্রপতি বিধ্যাদেবী ভাণ্ডারী ও প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকুমার দাহালের সঙ্গে বৈঠকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারত-নেপাল সহযোগিতার পথ আরও প্রশস্ত করার বিষয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৩ নভেম্বরের বৈঠকে কোশী-গঙ্গার যোগকে কাজে লাগিয়ে কলকাতা-কাঠমাণ্ডুকে জলপথে বাঁধার প্রস্তাব দেন নেপালের উপরাষ্ট্রপতি নন্দবাহাদুর পুন। নেপালের নিকটতম বন্দর কলকাতা ও হলদিয়া। জলপথে পণ্য পরিবহণ হলে স্বাভাবিকভাবেই খরচ কমে যায়। ভারত থেকে নেপালে এখন বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি পণ্য রপ্তানি হয়। নেপাল থেকে ভারতে রপ্তানি হয় প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার পণ্য। গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পাশাপাশি কাঠমাণ্ডুতে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে নাগরিক সংবর্ধনা, কাঠমাণ্ডু পুরসভার তরফ থেকে তার হাতে শহরের প্রতীকি চাবি তুলে দেওয়া, কাঠমাণ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি লিট প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

● **পার্লামেন্টে ভোট ছাড়া ব্রেক্সিট নয়, ইংল্যান্ডের হাইকোর্টের রায় :**

গত জুনে এক গণভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছেদে সিলমোহর দেয় ব্রিটেন। জনমত মাথা পেতে নিয়ে ইস্তফা দেন ব্রেক্সিট-বিরোধী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে টেরেসা মে বলেন, লিসবন চুক্তির ৫০ নম্বর ধারা অনুসারে ব্রাসেলস (ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর)-এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রেক্সিট-আলোচনা শুরু করবেন ২০১৭ সালের মার্চের শেষ থেকেই। পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়াই ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য টেরেসা মে-র সরকার 'রয়্যাল প্রেরোগেটিভ' নামে একটি আইনের আশ্রয় নেয়। যে আইনের সাহায্যে, রানির অনুমতি নিয়ে, পার্লামেন্টকে পাশ কাটিয়েই লিসবন চুক্তির ৫০ নম্বর ধারা চালু করতে পারবে সরকার, ব্রেক্সিট নিয়ে কথাবার্তা চালাতে পারবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে। সরকারের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার জিনা মিলার-সহ বেশ কয়েক জন ব্রেক্সিট-বিরোধী আন্দোলনকারী। সেই মামলাতেই ইংল্যান্ডের হাইকোর্ট ৪ নভেম্বর রায় দেয়—পার্লামেন্টে ভোটাভুটি ছাড়া ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না।

● **পানামা কাণ্ডে শরিফের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ :**

পানামা নথিতে নাম জড়ানোয় পয়লা নভেম্বর পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিল সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। চলতি বছরের মে মাসে কর-ফাঁকির স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত কিছু দেশে লগ্নির একটি তালিকা ফাঁস হয় পানামার আইনজীবী সংস্থা 'মোজাক ফঁসেকা'-র দপ্তর থেকে। লগ্নিকারীদের ওই তালিকায় রয়েছে বিশ্বের বেশ কিছু বিশিষ্ট ও ধনী ব্যক্তির নাম। অভিযোগ ওঠে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধেও। এই নিয়ে তার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠনের আর্জি জানিয়ে শীর্ষ আদালতে যায় প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা তথা রাজনীতিক ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দল। তাদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী তো বটেই এমনকী এই দুর্নীতি কাণ্ডে নাম জড়ানো তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধেও তদন্ত হোক। বিরোধী দলের এই আর্জি গ্রহণ করেই পানামা নথিতে প্রধানমন্ত্রীর নাম সামনে আসা এবং দুর্নীতির প্রশ্নে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিল পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত। কমিটির মাথায় থাকবেন একজন বিচারপতি।

● **আন্তর্জাতিক শান্তি সূচক :**

আন্তর্জাতিক সমাজ ও অর্থনীতি চর্চার সংস্থা 'ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস' (আইইপি)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ আইসল্যান্ড। আর সিরিয়া সব থেকে অশান্ত দেশ। সংস্থা প্রকাশিত দশম আন্তর্জাতিক শান্তি সূচক বা 'গ্লোবাল পিস ইনডেক্স' (GDI)-এর ২০১৬ সালের রিপোর্টে মোট ১৬৩-টি দেশ ও অঞ্চল জুড়ে সমীক্ষা চালানো হয়। সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ওই দেশের সঙ্গে বাকি দেশের দ্বন্দ্ব কতটা বা সামরিকীকরণের প্রভাবের মতো মাপকাঠির উপর ভিত্তি করে এই সমীক্ষা চালানো হয়। আইনল্যান্ডের পর স্থান পায় ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, নিউজিল্যান্ড ও পর্তুগাল। প্রথম দশে ঠাঁই হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি বা গ্রেট ব্রিটেনের মতো বিশ্বের প্রথম সারির কোনও দেশের। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে প্রথম দশে রয়েছে একমাত্র জাপান, নবম স্থানে। ভারত রয়েছে ১৪১তম স্থানে।

● **লিমায় অ্যাপেক শীর্ষ সম্মেলন :**

গত ২০ নভেম্বর পেরুর রাজধানী লিমায় 'অ্যাপেক' (এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন) শীর্ষ সম্মেলন আয়োজিত হয়। ১৯৮৯ সালে 'অ্যাপেক' গঠিত হয়। বর্তমানে এই সংগঠনের ২১-টি সদস্য দেশ হল—অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনেই, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালায়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তাইওয়ান (চিনা তাইপেই), হংকং, চিন, মেক্সিকো, পাপুয়া নিউ গিনি, চিলি, পেরু, রাশিয়া ও ভিয়েতনাম। প্রসঙ্গত, সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে দেখা হয় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের।

জাতীয়

● **পৃথ্বী-২ জোড়া উৎক্ষেপণ সফল :**

ওড়িশার সমুদ্র উপকূলের চাঁদিপুর টেস্ট রেঞ্জ থেকে গত ২১ নভেম্বর সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে একই সঙ্গে ছোড়া হয় দু'টি 'পৃথ্বী-২' ক্ষেপণাস্ত্র। তিন নম্বর লঞ্চ কমপ্লেক্স থেকে ছোড়া ওই দুই পরমাণু অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ পুরোপুরি সফল। ভারতের এই সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রটি ৩৫০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে পরমাণু হামলা চালাতে পারে। ৫০০ থেকে ১০০০ কিলোগ্রাম ওজনের পরমাণু অস্ত্রবহন করতে সক্ষম। তরল জ্বালানির জোড়া ইঞ্জিনের সাহায্যে এই ক্ষেপণাস্ত্র এগিয়ে যায় তার লক্ষ্যে।

প্রসঙ্গত, ৯ মিটার লম্বা ওই ক্ষেপণাস্ত্রটির প্রথম সফল উৎক্ষেপণ হয় ১৯৯৬ সালের ২৭ জানুয়ারি। সরকারিভাবে ক্ষেপণাস্ত্রটি ভারতীয় বিমান বাহিনীর হাতে আসে ২০০৩ সালে। তার পর ২০০৪ সাল পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্রটিকে ধাপে ধাপে উন্নত করা হয়। বহু দূর থেকে নিখুঁতভাবে শত্রুপক্ষের ঘাঁটি চিনে নিতে ও তার ওপর আঘাত হানতে সর্বাধুনিক 'ইনার্শিয়াল ন্যাভিগেশন সিস্টেম' রয়েছে এই ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্রে। ক্ষেপণাস্ত্রটি শত্রুপক্ষের অ্যান্টি-ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের নজরও এড়িয়ে যেতে পারে।

● **১০০ দিনের কাজের টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে :**

নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোনও শ্রমিক কাজ করার ১৫ দিনের মধ্যে মজুরির টাকা তার হাতে তুলে দিতে কেন্দ্র দায়বদ্ধ। তাই সময় বাঁচাতেই সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্যের হাত ঘুরে শ্রমিকদের কাছে টাকা পৌঁছতে আরও বেশি সময় লেগে যায়। তাছাড়া, একশো দিনের কাজ প্রকল্পে শ্রমিকদের আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করার পথেও অনেকটা এগিয়েছে

কেন্দ্র। প্রকল্পের আওতায় দেশে যত শ্রমিক কাজ করেন তার ৭৭ শতাংশ তথা সাড়ে ৮ কোটি শ্রমিককে এখন আধার কার্ডের ভিত্তিতে মজুরি দেওয়া হয়। শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে আধার কার্ড পুরোপুরি বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রসঙ্গত, আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করার পিছনে একটা বড় কারণ হল, ভুয়ো শ্রমিকের তালিকা তৈরি করে যেন প্রকল্পের টাকা অপচয় বা চুরি না হয়। যিনি শ্রম দিয়েছেন, তিনিই যেন মজুরি পান।

● **কৃষি সংস্কারে নীতি আয়োগের প্রতিবেদন :**

কৃষি সংস্কারের কাজে কোন রাজ্য কোথায় দাঁড়িয়ে, গত ১ নভেম্বর তার তালিকা প্রকাশ করে নীতি আয়োগ। আয়োগের তৈরি 'কৃষি বিপণন ও কৃষক-বান্ধব সংস্কার সূচক' অনুযায়ী প্রথম স্থানে মহারাষ্ট্র। গুজরাত দ্বিতীয় স্থানে। পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে ১৯-এ। রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, অসম, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে কৃষিতে সংস্কারের অর্ধেক কাজই হয়নি। প্রসঙ্গত, কৃষিক্ষেত্রে বহু দিন ধরেই বৃদ্ধির হার যথেষ্ট কম; ফলে কৃষি থেকে আয়ও কমে গিয়েছে। পরিস্থিতি শোধরাতে এমন নীতি তৈরি ও সংস্কারের কাজ করতে হবে, যাতে কৃষকরাও আধুনিকীকরণে উৎসাহিত হন। নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ অরবিন্দ পানাগড়িয়া তিনটি সংস্কারকে জরুরি বলে চিহ্নিত করেন—কৃষি বিপণনের সংস্কার, জমি লিজের সংস্কার, ব্যক্তিগত জমিতে গাছ লাগিয়ে আয়ের পথ তৈরির সুযোগ করে দেওয়া।

● **'ক্যামব্রিয়ান প্যাট্রোল'-এ ভারতীয় সেনার সোনা জয় :**

ওয়েলসে প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক সেনা মহড়া 'ক্যামব্রিয়ান প্যাট্রোল'-এর আয়োজন করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। তাতে বিশ্বের সব ক'টি দেশের সেনাবাহিনী অংশ নেয়। ওই পরীক্ষায় বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীকে কিছু কঠিনতম টাস্ক দেওয়া হয় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে করে ফেলার জন্য। সেই কঠিনতম কাজ—যেমন, অস্ত্রচালনা, রেডিও কমিউনিকেশন্স, মিডিয়া হ্যান্ডলিং ও হেলিকপ্টার ড্রিল—কত কম সময়ে কতটা দক্ষতার সঙ্গে কোন দেশের সেনাবাহিনী করতে পারছে, তার ওপরেই সেই দেশের সেনাবাহিনীকে 'নম্বর' দেওয়া হয়। এই পরীক্ষায় ৭৫ শতাংশ 'নম্বর' পেলে সোনার পদক দেওয়া হয়। এবার ভারতীয় সেনাবাহিনী গোর্খা রাইফেলসের সেকেন্ড ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের সৌজন্যে সোনা পায়। ৬৫ থেকে ৭৪ শতাংশ নম্বর পেলে দেওয়া হয় রুপোর পদক। আর ৫৫ থেকে ৬৪ শতাংশ 'নম্বর' পাওয়া কোনও দেশের সেনাবাহিনী পায় ব্রোঞ্জ পদক। আর ওই পরীক্ষায় যে দেশের সেনাবাহিনী ৫৫ শতাংশের চেয়ে কম নম্বর পায় তাদের কেবল শংসাপত্র দেওয়া হয়।

● **লিঙ্গ সমতায় ২১ ধাপ এগল ভারত :**

সম্প্রতি অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিচারে জেনিভা-ভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম 'আন্তর্জাতিক লিঙ্গ বৈষম্য সূচক'-এর বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। লিঙ্গ সমতায় গত বছর ভারত ছিল ১০৮ নম্বর স্থানে। সেখান থেকে এ বছর ২১ ধাপ এগিয়ে ভারতের স্থান ৮৭তম। বিশ্ব তালিকায় শীর্ষে আইসল্যান্ড।

● **অনলাইনে যৌন হেনস্থার অভিযোগ :**

এবার থেকে অনলাইনে যৌন হেনস্থার অভিযোগ জানাতে পারবেন কেন্দ্রীয় সরকারের মহিলা কর্মীরা। বিভিন্ন মন্ত্রকের মহিলা কর্মীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর ২৬ অক্টোবর একটি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানান কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী মেনকা গান্ধী। তার মন্ত্রকের সরকারি ওয়েবসাইটেই ওই অভিযোগ জানানো যাবে।

● **২০১৮ থেকে ফের দশম শ্রেণীতে বোর্ড পরীক্ষা সিবিএসই-র :**

গত ২৫ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে ২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে সিবিএসই (সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এগজামিনেশন)-র দশম শ্রেণীতে বোর্ডের পরীক্ষা ফের বাধ্যতামূলক হবে। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে সিবিএসই দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষাকে ঐচ্ছিক ঘোষণা করা হয়। এবার সমস্ত পরীক্ষার্থীদের জন্যই অভিন্ন বোর্ড পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রক। সিদ্ধান্ত হয়, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাস-ফেল থাকবে না। তবে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাস-ফেল থাকবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্যগুলি। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ফেল করলে সেই পড়ুয়াদের ফের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিতে হবে।

● **'একই কাজে সমবেতন' বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট :**

সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে এক ধরনের কাজে নিয়োগ করলে বেতনও দিতে হবে সমহারে। একই কাজের জন্য বেতনে কোনও বৈষম্য থাকলে তাকে 'শোষণমূলক দাস-ব্যবস্থা' বলেও বর্ণনা করে সর্বোচ্চ আদালতের বেঞ্চ। হরিয়ানার এক শ্রমিকের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে বিচারপতি জে. এস. খেহর এবং বিচারপতি এস. এ. বব্দের বেঞ্চ রায় দেয়, সমবেতনের নীতি দেশের সংবিধানেই স্বীকৃত। কোনও কর্মী স্থায়ী না অস্থায়ী, তার উপরে তার মজুরি বা বেতন নির্ধারিত হতে পারে না। একই কাজ করিয়েও অন্যদের চেয়ে কম বেতন দেওয়া শুধু সমবেতনের নীতির পরিপন্থীই নয়, মানুষ হিসাবেও তার মর্যাদাহানিকর। সংবিধানের ১৪১ ধারা এবং নানা সময়ে আদালতের বিভিন্ন রায় বিবেচনায় রেখে সমবেতনের নীতি থেকে সরে আসার কোনও পথ নেই বলে জানায় সংশ্লিষ্ট বিচারপতিদের বেঞ্চ।

● **টেরেসা মে প্রথম বিদেশ সফরে ভারতে :**

গত ৬ নভেম্বর তিন দিনের ভারত সফরে দিল্লি পৌঁছন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর সফরের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে প্রথম দেশ হিসেবে ভারতকে বেছে নেন তিনি। ব্রিটেনের মানুষ গণভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার (ব্রেক্সিট) পক্ষে রায় দেওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রী হন টেরেসা মে। তার এই সফরের কেন্দ্রেও রয়েছে ব্রেক্সিট-উত্তর ব্রিটিশ অর্থনীতির স্বার্থ। ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সচিব লিয়াম ফক্সও আসেন তার সঙ্গে। আর সঙ্গে আসেন সে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের একটি দল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনা হয় মে-এর। সেই বৈঠকে দু' দেশের মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক বা কৌশলগত সহযোগিতার সমস্ত দিক পর্যালোচনা হয়। নতুন 'ইন্ডিয়া-ইউকে টেক সামিট'-এর আনুষ্ঠানিক সূচনাও করেন দুই প্রধানমন্ত্রী। বণিকসভা সিআইআই এবং কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলনটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম সম্মেলন। পাশাপাশি বৈঠক হয় যৌথ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য কমিটিরও।

● **সিবিআই-কে বাড়তি ক্ষমতা :**

ভারতীয় নাগরিকরা বিদেশে অপরাধ করে দেশে পালিয়ে এলে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশান (সিবিআই)-কে বাড়তি ক্ষমতা দিল কেন্দ্র। অনেক সময়ে প্রত্যর্পণ চুক্তি না থাকায় অভিযুক্ত ভারতীয়কে ফেরত পাঠানো যায় না। আবার দেশের বাইরে অপরাধ করায় ভারতীয় সংস্থাও পদক্ষেপ করতে পারত না। এবার ভারতের আইন মেনে মামলা করতে পারবে সিবিআই।

● **ভারত ও জাপানের অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি সই :**

গত ১১ ও ১২ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাপান সফরে যান। সফর চলাকালীনই জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সঙ্গে অসামরিক ক্ষেত্রে পরমাণু সহযোগিতার চুক্তি সই করেন মোদী। প্রসঙ্গত, পরমাণু বোমায় বিধ্বস্ত হওয়া বিশ্বের একমাত্র দেশ জাপান। তারা এই প্রথম কোনও দেশের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি করল, যারা পরমাণু (অস্ত্র) প্রসার রোধ চুক্তি (এনপিটি)-তে সই করেনি। এই চুক্তির ফলে ভারত জাপানের পরমাণু বাজারে প্রবেশাধিকার পেল। অন্যদিকে, আমেরিকা, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, ফ্রান্স, নামিবিয়া, আর্জেন্তিনা, কানাডা, কাজাখস্তান ও অস্ট্রেলিয়া-সহ মোট দশটি দেশের সঙ্গে এর আগেই ভারত পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে চুক্তি সই করেছে। জাপানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে জাপানের সঙ্গে সেই শীর্ষ বৈঠকেই বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আরও ৯-টি চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারত।

● **'আয়ুষ'-এ পিএইচডি শুরু করার প্রস্তাব :**

গত ২৬ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথির (আয়ুষ) গবেষণা শুরুর প্রস্তাব আনল—অর্থাৎ, ওই পাঁচটি বিষয়ে পিএইচডি চালু করা হবে। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে 'ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ মেডিসিন অ্যান্ড হোমিওপ্যাথি' নামে শুরু হলেও পরে তা কিছুটা অদল-বদল করে তৈরি হয় 'আয়ুষ' (আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথির সংক্ষিপ্ত নাম)। ২০১৪ সালে পৃথকভাবে গঠিত হয় আয়ুষ মন্ত্রক। উদ্দেশ্য, বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো। পরবর্তীকালে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেশের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়াদের আয়ুর্বেদ, যোগ বা হোমিওপ্যাথি নিয়ে গবেষণার সুযোগ দিতে ইউজিসিকে অনুরোধ করা হয়। তাই এবার নতুন এই উদ্যোগ। প্রতি বছর ২০০ জন পড়ুয়াকে স্কলারশিপ দেবে আয়ুষ মন্ত্রক। এদের মধ্যে স্নাতকোত্তরে যারা আয়ুষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছেন এমন ১২৫ জনকে এবং বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগের ৭৫ জন পড়ুয়াকে ওই পাঁচটি বিষয়ে গবেষণা করার জন্য বৃত্তি দেবে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলগুলি।

উপ-নির্বাচনের ফলাফল

পশ্চিমবঙ্গ-সহ ৬ রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গত ১৯ নভেম্বর উপ-নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ হয়।

২২ নভেম্বর ভোট গণনা হয়। জয়ী প্রার্থীদের তালিকা :

➢ **লোকসভা :**
- অসমের লাখিমপুর—প্রদান বরুয়া (বিজেপি)
- মধ্যপ্রদেশের শাহদোল—জ্ঞান সিং (বিজেপি)
- পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার—প্রার্থপ্রতিম রায় (টিএমসি)
- পশ্চিমবঙ্গে তমলুক—দিব্যেন্দু অধিকারী (টিএমসি)

➢ **অসম বিধানসভা :**
- বৈঠালাংসো—ড. মানসিংহ রোংপি (বিজেপি)

➢ **মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা :**
- নেপানগর—মঞ্জু দাদু (বিজেপি)

➢ **পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা :**
- মন্তেশ্বর—সৈকত পাঁজা (টিএমসি)

➢ **তামিলনাড়ু বিধানসভা :**
- আরাভাকুরুচি—এম. রেঙ্গাস্বামী (এআইএডিএমকে)
- থাঞ্জায়ুর—এম. সেন্থিল (এআইএডিএমকে)
- থিরুপরনকুণ্ডরম—এ. কে. বোস (এআইএডিএমকে)

➢ **ত্রিপুরা বিধানসভা :**
- বড়জলা—ঝুমা সরকার (সিপিআইএম)
- খোয়াই—বিশ্বজিৎ দত্ত (সিপিআইএম)

➢ **অরুণাচলপ্রদেশ বিধানসভা :**
- হায়ুলিয়াং—ডেসিঙ্গু পুল (বিজেপি-এনইডিএ)

➢ **পুদুচেরি বিধানসভা :**
- নেল্লিথোপ—ভি. নারায়ণস্বামী (কংগ্রেস)

পশ্চিমবঙ্গ

● **বেঙ্গল কেমিক্যালস-এ মুনাফা, কেন্দ্রের স্বীকৃতি :**

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৯০১ সালে চালু করেন বেঙ্গল কেমিক্যালস (বিসিপিএল)। কলকাতার মানিকতলায় প্রথম কারখানা। পরে পানিহাটি এবং মুম্বই ও কানপুরে বিস্তৃতি। সংস্থাটির ১৯৭৭ সালে জাতীয়করণ হয়। ঐতিহাসিক গরিমা হারিয়ে ১৯৯২ সালে

বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল রিকনস্ট্রাক্শান (বিআইএফআর)-এর আওতায় চলে যায়। ২০০৬ সালে পুনর্গঠনের পরেও সংস্থার হাল খারাপ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ২০১৩-'১৪ সালে আয় কমে দাঁড়ায় ১৭ কোটি টাকায়। পরের বছর ২০১৫-'১৬ সালে অবশ্য আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৯৬ কোটি টাকা। বিসিপিএল-এর এমডি তথা ডিরেক্টর (ফাইন্যান্স) পি. এম. চন্দ্রাইয়া ২৪ অক্টোবর জানান যে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া যাণ্মাসিকে সংস্থার নিট মুনাফা ১.১৬ কোটি টাকা। আয় ৫১.৩৭ কোটি টাকা। আর ১৬ নভেম্বর সংস্থার এমডি জানান, ২০১৫-'১৬ সালের জন্য কেন্দ্রের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সংক্রান্ত দপ্তরের (ডিপিই) কাছ থেকে 'এক্সেলেন্ট' রেটিং পেয়েছে বিসিপিএল। প্রসঙ্গত, ডিপিই বিভিন্ন মাপকাঠিতে ২৯৮-টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মূল্যায়ন করে।

● **রাজ্যের 'শিশু আলয়'-এর প্রশংসায় ইউনিসেফ ও কেন্দ্র :**

গত বছর প্রাথমিকভাবে শিশুদের স্কুলে যাওয়ার ভীতি কাটাতে 'শিশু আলয়' নামে একটি প্রকল্প শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, অসম ও রাজস্থানে। এই প্রতিটি রাজ্যের ২০-টি জেলায় ওই প্রকল্প শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক বছরের মাথায় ইউনিসেফ-এর সমীক্ষা বলছে, পাঁচ রাজ্যের মধ্যে সব থেকে ভাল কাজ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ওই প্রকল্পে রাজ্যের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকও।

উল্লেখ্য, গত এক বছরে এ রাজ্যের প্রায় এক হাজারটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র বা শিশু আলয়-এ রূপান্তরিত করা হয়। শুরু থেকেই প্রকল্পটি জেলা সদর বা ব্লক লেভেলেই সীমাবদ্ধ না থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সব ক'টি কেন্দ্রের মান যাতে একই রকমের হয়, সে জন্যও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এছাড়া, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ইউনিসেফ-এর মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতিটি জেলা সদরে একটি মডেল 'শিশু আলয়' গড়ে তোলা হয়। কর্মীদের বলে দেওয়া হয় যে সেই মডেলের ভিত্তিতেই নিজেদের এলাকায় শিশু আলয় গড়ে তুলতে হবে। যার ফলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য মেলে।

● **লগ্নি টানতে দাম কমলো জমির :**

গত ২৪ অক্টোবর রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বিনিয়োগ টানতে উপনগরীর জমির ন্যূনতম দাম একধাক্কায় ২৬ শতাংশ কমানো হবে। শিলিগুড়ি, কল্যাণী, আসানসোল, হাওড়া এবং বারুইপুর—রাজ্যের এই পাঁচ জায়গায় পাঁচটি থিমে যথাক্রমে, তিস্তা, সমৃদ্ধি, অগ্নিবীণা, স্পোর্টস সিটি এবং উত্তম নামক উপনগরী তৈরির জন্য বছর খানেক আগেই সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। প্রস্তাবিত উপনগরীগুলি তৈরির জন্য বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ইচ্ছাপত্র (এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট) চাওয়া হয়।

● **'ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য' তালিকায় রাজ্য ১৫তম :**

গত ৩১ অক্টোবর শিল্পবান্ধব রাজ্যগুলির তালিকা প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রক। বিশ্বব্যাংকের সাহায্যে তৈরি 'ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য' রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ ঠাঁই পায় ১৫ নম্বরে। কোনও রাজ্যে শিল্প গড়া ও ব্যবসা করা কত সহজ, তা খতিয়ে দেখে গত বছর থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করছে বাণিজ্য মন্ত্রক। লক্ষ্য, এ নিয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করা, যাতে সার্বিকভাবে সারা দেশে ব্যবসার পথ সুগম হয়। গত বছর এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ ছিল ১১ নম্বরে। এবার পিছিয়েছে চার ধাপ। তামিলনাড়ুর মতো শিল্পোন্নত রাজ্যও এবার পশ্চিমবঙ্গের থেকে পিছিয়ে পড়েছে। কর্ণাটকের মতো রাজ্য মাত্র দু' ধাপ এগিয়ে। আগেরবার পিছিয়ে থাকা তেলঙ্গানা, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্যগুলি উঠে এসেছে প্রথম দশে। যুগ্মভাবে প্রথম অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানা। তাদের ঠিক পিছনেই গতবারের এক নম্বর গুজরাত।

প্রসঙ্গত, জমির বন্দোবস্ত, নির্মাণের অনুমতি, এক-জানলা ব্যবস্থা, অনলাইনে কর জমা, পরিবেশ ছাড়পত্র, সহজে তথ্য জোগান ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, শ্রমক্ষেত্রের মতো দশটি ক্ষেত্রে ৩৪০-টি সংস্কারের কাজ নির্ধারিত হয়। রাজ্যগুলির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই কোথায় কতখানি কাজ হয়েছে, তার বিচার করে স্কোরকার্ড তৈরি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তি ৮৪.২৩ শতাংশ। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানার স্কোর ৯৮.৭৮ শতাংশ। রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩৪০-টি সংস্কারের কাজের মধ্যে এ রাজ্যের ৫৩-টি কাজ বাকি।

● **অনলাইন নিলাম ডেকে বালি তোলার ইজারা :**

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদী থেকে বালি তোলার অধিকার দিতে এবার অনলাইন নিলাম ডাকবে রাজ্য সরকার। আর শুধু নিলামে সর্বোচ্চ দর হাঁকলেই চলবে না; বালি তোলার জন্য আবশ্যক পরিবেশ-ছাড়পত্রও। এ যাবৎ 'আগে এলে আগে সুযোগ'-এর ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদে বালিঘাট ইজারা দেওয়া হতো। কেন্দ্র ২০১৫ সালে নতুন খনি-আইন প্রণয়ন করে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত বালিঘাটকে বেআইনি তকমা দিয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। তাই, নতুন নিয়ম বলবৎ করতে খনি-আইন মোতাবেক দু'টি নতুন বিধি (ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনর মিনারেল কনসেশন রুলস-২০১৬ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনর মিনারেল অক্শন রুলস-২০১৬) তৈরি করে রাজ্য বিধানসভায় পাস করানো হয়।

সরকারি হিসেবে, রাজ্যের কম-বেশি সাতশো বালিঘাট থেকে এখন বছরে সাড়ে তিনশো কোটি টাকার মতো রাজস্ব আদায় হয়। নিলাম চালু হলে অঙ্কটা অন্তত এক হাজার কোটিতে পৌঁছে যাব বলে আশা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের সিংহভাগ বালিঘাট রয়েছে বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, হুগলি, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। শুখা নদী থেকে বালি তোলা হয় সবচেয়ে বেশি। আগে কাজটা নিয়ন্ত্রণ করত ভূমিসংস্কার দপ্তর। দু' বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্বটি তুলে দিয়েছেন সেচ দপ্তরের হাতে।

● **সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি-র অনুমোদন :**

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাকে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে ১,০০০ মেগাওয়াটের তুর্গা পাম্প স্টোরেজ বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন দিল সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (সিইএ)। আগেই ৯০০ মেগাওয়াটের পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রকল্পটি গড়ে

ওঠে। অযোধ্যা পাহাড়ের গায়ে তুর্গা নালার জল ব্যবহার করে নতুন একটি পাম্প বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা যে সম্ভব, সিইএ নিজেই তা রাজ্যকে জানায়। রাজ্য সেই পরামর্শ মতো তুর্গা প্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়। ২৫০ মেগাওয়াট করে চারটি ইউনিট মিলিয়ে মোট ১,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্পটির প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করা হয়। প্রকল্পের খরচ ধরা হয় ৪,২০০ কোটি টাকা। এই রিপোর্টই সিইএ-র কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। তবে বন মন্ত্রকের ছাড়পত্র পাওয়া এখনও বাকি। কারণ, তুর্গা প্রকল্প নির্মাণ করতে গেলে অযোধ্যায় ৫৭৮ একর জমির প্রয়োজন। আর সেই জমি নেওয়া হচ্ছে রাজ্যের বন দপ্তরের কাছ থেকে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী, এক্ষেত্রে সমপরিমাণ জমি বন দপ্তরকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

উল্লেখ্য, সিইএ সারা দেশে ৫৬-টি জায়গা এই ধরনের জলাধার ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য চিহ্নিত করেছে। এগুলি থেকে ভবিষ্যতে মোট ৯৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেই কম পক্ষে ন'হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব বলে সিইএ তাদের রিপোর্টে কেন্দ্রকে জানায়।

● **পণ্য প্রবেশ কর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় :**

পণ্য প্রবেশ কর ঘিরে তৈরি হওয়া দীর্ঘ দিনের আইনি জটে গত ১১ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে রাজ্যে ঢোকা পণ্যের উপর প্রবেশ কর বসানোর সাংবিধানিক অধিকার রাজ্যগুলির রয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের সামনে অন্তত ৩,৫০০ কোটি টাকা বকেয়া কর আদায়ের পথ খুলল বলে মনে করছে রাজ্য অর্থ দপ্তর। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রতিটি রাজ্যের সমস্যা আলাদা। এই কারণে রাজ্যগুলির জন্য আলাদা আলাদাভাবে সুপ্রিম কোর্টেই ছোট ছোট তিন বা পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই বেঞ্চই সংশ্লিষ্ট রাজ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেবে।

প্রসঙ্গত, ২০১২-'১৩ সালে প্রথম পণ্য প্রবেশ কর বসাতে আইন পাস হয় এ রাজ্যে। সে বছর এই খাতে আয় হয় প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা। কিন্তু কাঁচামালের উপর যুক্তমূল্য কর বসার পরে আবার এই প্রবেশ কর দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নিয়ে প্রতিবাদ জানায় রাজ্যের বেশ কিছু সংস্থা। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তারা। সেই মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চ প্রথমে রাজ্যের আইনটি বেআইনি ঘোষণা করে। তখন রাজ্য আপিল মামলা হাইকোর্টে দায়ের করে। হাইকোর্ট বলে, রাজ্যের ওই কর আদায়ের অধিকার থাকলেও কোনও সংস্থাকে জোর করা যাবে না। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়ের জেরে বহু সংস্থাই তা দেওয়া বন্ধ করে। ফলে বছরে ১,২০০ কোটি টাকার আয় কমে গড়ে ৬৫০ কোটির কাছাকাছি নামে। এখন সেই বকেয়া দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটিতে। দেশের অন্য রাজ্যগুলির সব মিলিয়ে এই খাতে প্রাপ্য প্রায় ৩০ হাজার কোটি। বস্তুত, বকেয়া আদায়ের সূত্র ধরেই রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে।

● **প্রশাসনিক সংস্কারে নতুন সিদ্ধান্ত :**

গত ২১ নভেম্বর রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে ঠিক হয় প্রশাসনিক সংস্কারের প্রথম ধাপে প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, জলপাইগুড়ির পাশাপাশি মেদিনীপুর এবং মালদহে আরও দু'টি বিভাগ (ডিভিশন) গঠন করা হবে। নতুন কাঠামোয় প্রেসিডেন্সি বিভাগে থাকবে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং হাওড়া। বর্ধমান বিভাগের অধীনে বর্ধমান, হুগলি এবং বীরভূম, জলপাইগুড়ি বিভাগে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলা। নবগঠিত মেদিনীপুর বিভাগের অধীনে দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলা। মালদহ বিভাগের অধীনে মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং দুই দিনাজপুর। প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন প্রধান সচিব পদমর্যাদার একজন অফিসার।

● **পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম :**

এমনিতেই রাজ্যের পাঁচ পরিবহণ নিগমের প্রতিটি সংস্থাই ভরতুকিতে চলে। শুধু সিটিসি, সিএসটিসি ও ভূতল পরিবহণ নিগমের জন্য গত বছর ৪২৪ কোটি টাকা ভরতুকি দিতে হয়। বাকি দুই নিগম উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমকে ভরতুকি দেওয়া হয় আরও প্রায় ১৯৫ কোটি টাকা। পাঁচটি নিগমকে একত্রিত করলে কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর বৈষম্য দূর করতে আরও কয়েকশো কোটি টাকা ভরতুকি দিতে হবে। তাই তিনটি সংস্থাকে (সিটিসি, সিএসটিসি ও ভূতল পরিবহণ নিগম) মিশিয়েই নতুন নিগম তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাজ্য সরকারের গত জুন মাসের এই সিদ্ধান্তের পরই ৩ নিগমের বোর্ড ও পরিচালন ব্যবস্থার সংযুক্তিকরণ শুরু করে পরিবহণ দপ্তর। আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পুরোনো নিগমের নাম মুছে নতুন নাম—পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম (ডব্লিউবিটিসি)—লেখার কাজ শেষ করার নির্দেশ দেয় পরিবহণ দপ্তর। ফলে পথে-ঘাটে সরকারি বাসের গায়ে আর দেখা যাবে না সিএসটিসি, সিটিসি বা পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগমের নাম। ট্রামের গায়েও লেখা থাকবে না সিটিসি। সরকারি লঞ্চ আর জেটিতেও নেই ভূতল পরিবহণ নিগমের নাম।

● **হলদিয়ায় নয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র :**

হলদিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করছে ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন। লগ্নি ৩,৫০০ কোটি টাকা। নতুন কেন্দ্র গড়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কেনার দিকেও নজর দিচ্ছে এই সংস্থা। অন্ধ্রপ্রদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র মীনাক্ষি এনার্জি কেনে তারা। ১,০০০ মেগাওটাটের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ফরাসি বিদ্যুৎ সংস্থা অ্যাঙ্গির মালিকানাও তারা কেনে। এছাড়া প্রযুক্তি ও পরিচালন দক্ষতা বাড়াতে বিদেশি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে ইন্ডিয়া পাওয়ার।

অর্থনীতি

● **নোট বাতিলের প্রভাব খতিয়ে দেখবে কমিটি :**

সাধারণ মানুষ ও অর্থনীতির উপর ৫০০ ও ১,০০০ টাকার নোট বাতিলের প্রভাব খতিয়ে দেখতে কমিটি তৈরি করল কেন্দ্র। অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, ডিরেক্টর, ডেপুটি সচিব পর্যায়ের প্রায় ৭০ জন

অফিসারকে নিয়ে ৩২-টি দল গঠন করেছে কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তর (ডিওপিটি)। বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন অফিসাররা এবং তার পর তারা সরকারকে তাদের বক্তব্য ও অভিমত জানাবেন। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর থেকে এই অফিসারদের নেওয়া হয়। তিনজন করে অফিসারদের নিয়ে গঠিত এক-একটি দল পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যাবে পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, হিমাচলপ্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবে। তেলেঙ্গানা, কেরালা, হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, গোয়া এবং অসমে যাবে দুই সদস্যের দল। এছাড়া নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচলপ্রদেশ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, আন্দামান ও নিকোবর, লাক্ষাদ্বীপ, পুদুচেরি ও সিকিমে যাবেন একজন করে আধিকারিক।

● **রিজার্ভ ব্যাংকের নয়া পদক্ষেপ :**

নোট বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে গত ২১ নভেম্বর এক বিবৃতিতে রিজার্ভ ব্যাংক জানায়, যে-সমস্ত গৃহঋণ, গাড়িঋণ, কৃষিঋণ এবং অন্যান্য ধার ১ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শোধ করার কথা, তা মেটাতে ৬০ দিন বাড়তি সময় দেওয়া হবে। তবে তার সর্বোচ্চ অঙ্ক হতে পারবে ১ কোটি টাকা। এর ফলে, ব্যাংক, ব্যাংক নয় এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফসি), এমনকী ক্ষুদ্র-ঋণ সংস্থার কাছে এক কোটির কম ধার নেওয়া সকলেই এতে উপকৃত হবেন। একই সঙ্গে, ছোট শিল্প ও ব্যবসায়ীদের হাতে নগদের জোগান বাড়ানোর লক্ষ্যে ওভারড্রাফ্ট ও ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট থেকে তাদের টাকা তোলার সাপ্তাহিক সীমা বাড়িয়ে করা হয় ৫০ হাজার। তবে শর্ত হল, সেই অ্যাকাউন্ট অন্তত তিন সপ্তাহের পুরনো হতে হবে।

● **প্রভিডেন্ট ফান্ডে রদবদল :**

প্রভিডেন্ট ফান্ডের যেসব অ্যাকাউন্ট 'চালু নেই', সেগুলিতেও যাতে ফি-মাসে ৮.৮ শতাংশ হারে সুদ দেওয়া হয়, সে ব্যাপারে ১১ নভেম্বর সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের দাবি, এতে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ শ্রমিক, কর্মচারী উপকৃত হবেন। কোনও প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট-এ শেষ ৩৬ মাসে কোনও টাকা জমা না পড়লে তাকেই 'অচল পিএফ অ্যাকাউন্ট' বা 'ইনঅপারেটিভ অ্যাকাউন্ট' বলা হয়। ২০১১ সাল থেকে সেগুলিতে সুদ জমা পড়ছে না।

অন্যদিকে, চাকরিরত অবস্থায় কোনও কর্মীর মৃত্যু হলে পরিবারের তরফে প্রভিডেন্ট ফান্ডের 'ক্লেম' বা টাকা তোলার আবেদন জমা দেওয়ার সাত দিনের মধ্যে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে হবে। পিএফ দপ্তরগুলিকে এই নির্দেশ দিয়েছে অছি পরিষদ। পাশাপাশি, অবসরের আগে বা ওই দিনই যাতে কর্মীদের পিএফ সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরি হয়ে যায়, তা-ও নিশ্চিত করতে বলেছে তারা।

● **কৃষ্ণা-গোদাবরী গ্যাস ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বিক্রি করতে আগ্রহ :**

কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকার কেজি-ডি৬ গ্যাস ক্ষেত্রে নিজেদের ১০ শতাংশ অংশীদারিত্ব বিক্রি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে কানাডার সংস্থা নিকো রিসোর্সেস। ওই ক্ষেত্রের সিংহভাগ অংশীদারিত্ব (৬০ শতাংশ) রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজের হাতে। আর বাকি ৩০ শতাংশ ব্রিটিশ তেল সংস্থা বিপি-র। এর আগে গত বছরে প্রথমবার ওই গ্যাস ক্ষেত্রের শেয়ার বিক্রির কথা জানায় নিকো। বাজারে তাদের ধার রয়েছে প্রায় ৩৪ কোটি ডলার। কিন্তু ক্রেতা না-মেলায় সেই পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয় নিকো। এবার ওই শেয়ার বিক্রি নিয়েই ফের কথাবার্তা শুরু করে সংস্থা। উল্লেখ্য, কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন' বা ওএনজিসি-র ভাগের গ্যাসের কিছুটা তুলে নেওয়ার অভিযোগে কিছু দিন আগেই রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ, বিপি এবং নিকো-র জোটের বিরুদ্ধে ১৫৫ কোটি ডলার (প্রায় ১০,৩৮৫ কোটি টাকা) ক্ষতিপূরণ দাবি করে নোটিস পাঠায় কেন্দ্র।

● **সেপ্টেম্বরে পরিকাঠামো শিল্পে ৫ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি :**

গত ৩১ অক্টোবর প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানে জানানো হয় যে সেপ্টেম্বর মাসে দেশে আটটি পরিকাঠামো শিল্পে উৎপাদন বাড়ে ৫ শতাংশ হারে, গত তিন মাসে যা সবচেয়ে বেশি। কয়লা, অশোধিত খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পরিশোধনাগারে উপজাত পণ্য, সার, ইস্পাত, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ—পরিকাঠামো ক্ষেত্রে এই আটটি শিল্পের গুরুত্ব ৩৮ শতাংশ। এ বছর সেপ্টেম্বরে পরিকাঠামো শিল্পের হাল ফেরায় সিমেন্ট শিল্পে ৫.৫ শতাংশ, ইস্পাতে ১৬.৩ শতাংশ এবং তেল শোধনে ৯.৩ শতাংশ হারে উৎপাদন বৃদ্ধি। সার এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২ শতাংশ এবং ২.২ শতাংশ। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের হার ছিল ১৮.৩ শতাংশ ও ১১.৪ শতাংশ। তবে কয়লা, অশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন এবার সরাসরি কমেছে যথাক্রমে ৫.৮ শতাংশ, ৪.১ শতাংশ ও ৫.৫ শতাংশ। অন্যদিকে, আগস্টে সরাসরি ০.৭ শতাংশ কমার পরে, সেপ্টেম্বরে মাত্র ০.৭ শতাংশ বাড়ল দেশের শিল্পোৎপাদন। খনন শিল্প ও মূলধনী পণ্যের উৎপাদন ধাক্কা খায় ওই মাসে। খারাপ ফল করে উৎপাদন শিল্পও।

● **'ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য'-এর মাপকাঠি খতিয়ে দেখবে বিশ্বব্যাংক :**

ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য (ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস)-এর নিরিখে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের তালিকায় এবার ১৩০ নম্বরে জায়গা পায় ভারত। গতবার ছিল ১৩১। মাত্র একটি ধাপ ওপরে ওঠায় সরকার দাবি তোলে এই তালিকা তৈরির পদ্ধতি পাল্টানো হোক। গত ৩১ অক্টোবর বিশ্বব্যাংকের নতুন ভারতীয় প্রধান জুনেইদ আহমেদ এই দাবি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, একই মডেল সব ক্ষেত্রে খাটবে না, তা বোঝা যাচ্ছে। সে জন্যই তালিকা তৈরির পদ্ধতির পরামর্শ খতিয়ে দেখা হবে। ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়ার মতো বড়ো দেশগুলিও কেন্দ্রীয় স্তর থেকে নিচের স্তরে সংস্কারের কাজকে নিয়ে যায়। যদিও একই সঙ্গে তার যুক্তি, এই একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশ থেকে ভাল সাড়াও মিলেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ বিষয়ে সব মন্ত্রকের কাছে এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। কারণ তার লক্ষ্য, আগামী দু' এক

বছরের মধ্যে দেশকে এই তালিকার প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে তুলে নিয়ে আসা। এই তালিকায় স্থান কোথায়, তার উপরে বিদেশি লগ্নিও অনেকটাই নির্ভর করে। যে কারণে মোদী ক্যাবিনেট সচিব-সহ সব মন্ত্রকের সচিবদেরই রিপোর্টটি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

● **কৃষিক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি :**

গত ২৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বন্দারু দত্তাত্রেয় ঘোষণা করেন যে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের তৃতীয় শ্রেণির শহরে কৃষিক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নতুন মজুরি হবে দিনে ৩৫০ টাকা। গত পয়লা নভেম্বর থেকেই তা চালুর জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বর্তমানে ওই ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি দিনে ১৬০ টাকা।

● **বিদেশি পাটে শাস্তি-শুল্কের প্রস্তাব :**

বিদেশি চটের বস্তা বা বিদেশের কাঁচা পাট কিনে তৈরি বস্তার ব্যবহারে রাশ টানতে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেল অফ অ্যান্টি-ডাম্পিং অ্যান্ড অ্যালায়েড ডিউটিজ (ডিজিএডি) বিদেশি বস্তা ও পাটে ৫ থেকে ২০ শতাংশ হারে শাস্তিমূলক আমদানি শুল্ক বসানোর সুপারিশ করে। ১৯৮৭ সালে চালু জুট প্যাকেজিং মেটেরিয়ালস (কম্পালসরি ইউজ ইন প্যাকিং কমোডিটিজ) আইন অনুযায়ী নির্দেশ জারি হয় আগেই। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের এক্সপোর্ট প্রোমোশন ব্যুরোর একটি হিসেবে দেখা গিয়েছে, ২০০৮ থেকে চলতি বছর পর্যন্ত এ দেশে শুধু কাঁচা পাট রপ্তানি হয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় ৭০৫৭ কোটি টাকার। ভারতের শুল্ক-তালিকায় কাঁচা পাট নিঃশুল্ক। ফলে বিনা শুল্কেই পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এই বিদেশি পাট।

● **এসএমএস-এ উৎসে কর কাটার তথ্য :**

এবার থেকে তিন মাসে উৎসে কর কতটা কাটা হল (টিডিএস), তা ২.৫ কোটি চাকরিজীবী আয়করদাতাকে এসএমএস মারফত জানাবে আয়কর দপ্তর। গত ২৪ অক্টোবর এই পরিষেবা চালু করেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। এর ফলে টিডিএস-এর ক্ষেত্রে সব ঠিক আছে কি না, তা অফিসের স্যালারি স্লিপ ও এসএমএস-এ পাওয়া তথ্য মিলিয়ে দেখে নিতে পারবেন আয়করদাতারা; আর অর্থবর্ষ শেষে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, কর বাকি আছে কি না। এখন প্রতি তিন মাসে এসএমএস পাঠানোর পরিষেবা চালু হলেও, শীঘ্রই টিডিএস-এর তথ্য মাসে মাসে পাওয়ার সুবিধা আনবে কর দপ্তর। পাশাপাশি এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে চাকরিজীবী নন এমন ৪.৪ কোটি করদাতাকেও।

● **'উড়ান' প্রকল্প ঘোষণা :**

গত ২১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহণ মন্ত্রক আঞ্চলিক বিমান পরিবহণ প্রকল্প (রিজিওনাল কনেক্টিভিটি স্কিম) ঘোষণা করে। পুরো নাম—'উড়ে দেশ কা আম নাগরিক' বা সংক্ষেপে 'উড়ান' (ইউডিএএন)। পরিকল্পনার কথা জানানো হয় আগেই। এবার ছোট শহরগুলির মধ্যে স্বল্প পাল্লার (১ ঘণ্টা) উড়ান বাড়াতে তার ৫০ শতাংশ আসনে সর্বোচ্চ ভাড়া ২,৫০০ টাকায় বেঁধে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে কেন্দ্র। আর এর জন্য তহবিল জোগাড় করতে সাধারণ রুটে শুল্ক বসানোর কথাও বলা হয়। বিমানমন্ত্রী অশোক গণপতি রাজু জানান, এর আওতায় ছোট শহরগুলির মধ্যে প্রথম উড়ানটি আকাশে পাড়ি দিতে পারে আগামী বছর থেকেই। ভাড়ার এই ঊর্ধ্বসীমা অবশ্য ভোগ্যপণ্য সূচকের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করে দেখা হবে। পাশাপাশি গন্তব্যে পৌঁছতে উড়ান কতটা সময় নেবে, সেই অনুযায়ীও তা আলাদা হতে পারে। মন্ত্রকের দাবি, এই সব ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উড়ানে ভাড়া ১,৪২০ থেকে ৩,৫০০ টাকার মধ্যেই থাকবে। হেলিকপ্টারের ক্ষেত্রে, আধ ঘণ্টায় ২,৫০০ টাকা আর এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগলে সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **ইসরো-র সাফল্য, নতুন পরিকল্পনা :**

২০১৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রথম প্রচেষ্টাতেই মঙ্গলের কক্ষপথে মহাকাশযান 'মঙ্গলযান'-কে পৌঁছে বিশ্বকে চমকে দেয় ইসরো (উৎক্ষেপণ ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর)। প্রথম প্রচেষ্টায় এই সাফল্য নজিরবিহীন। মঙ্গলযান প্রকল্পে ব্যয় হয় ৪৫০ কোটি টাকা। অভিযানের মেয়াদ হওয়ার কথা ছিল মাত্র ৬ মাস। সেই পরিকল্পনা ছাপিয়ে, ভারতের মঙ্গলযান এখন কক্ষপথে সফলভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকার প্রচ্ছদে মঙ্গলযান থেকে তোলা ছবি ছাপানো হয়। মঙ্গলযান থেকে তুলনায় কম-দামের ক্যামেরার সাহায্যে যে ছবি তোলা হয়, এর আগে ৫০-টিরও বেশি অভিযানে এমন উচ্চ-মানের ছবি নেওয়া সম্ভব হয়নি।

আগামী জানুয়ারি মাসে মহাকাশে এক সঙ্গে ৮৩-টি উপগ্রহ পাঠাতে চলেছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থাটি। এখনও পর্যন্ত এক সঙ্গে ৩৭-টি উপগ্রহ পাঠানোর নজির রয়েছে রাশিয়ার দখলে। তারপরেই আমেরিকা, ২৯-টি। এ বছরের ২২ জুন ২০-টি উপগ্রহ পাঠিয়ে তৃতীয় স্থানে ভারত। আগামী বছরে ইসরোর এই প্রচেষ্টা সফল হলে তা সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে যাবে। আরও একটা নতুন পালক জুড়বে ভারতের মুকুটে। গত আড়াই বছরে মহাকাশ বিজ্ঞানে একের পর সাফল্যের পথে হেঁটেছে ভারত। যদি ২০১৭-র এই মিশন সফল হয়, তা হবে মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নয়া পদক্ষেপ। মহাকাশে যে ৮৩-টি উপগ্রহ পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরো, তার মধ্যে ৬০-টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ২০-টি ইউরোপের এবং ২-টি ব্রিটেনের।

● **'সার্ন'-এর সহযোগী সদস্য ভারত :**

অবশেষে বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল গবেষণাগার 'ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশান ফর নিউক্লিয়ান রিসার্চ', বা 'সার্ন'-এর অ্যাসোসিয়েট মেম্বার বা সহযোগী সদস্যে উন্নীত হল ভারত। এর জন্য ভারতীয় মুদ্রায় ৮০ কোটি টাকার বার্ষিক সদস্য চাঁদা দিতে হবে ভারতকে। গত ২১ নভেম্বর এই মর্মে মুম্বইতে চুক্তি সই হয়। সই করেন ভারতের আণবিক শক্তি বিভাগের সচিব শেখর বসু ও সার্ন-এর ডিরেক্টর

জেনারেল ফ্যাবিওলা জিয়ানোতি। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হল কীভাবে, কোন বস্তু দিয়ে তৈরি এই মহাবিশ্ব, সৃষ্টির সময়ে পরিবেশটাই বা কেমন ছিল—ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত এই গবেষণাগারে ৫৪ বছর ধরে এমন বহু প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন শতাধিক দেশের তেরো হাজারের বেশি বিজ্ঞানী। ১৯৯১ সাল থেকে এই গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ভারত। একাধিক গবেষণা প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন ভারতের বহু বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার। পরবর্তী সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য অতিথি সদস্য হিসেবে স্বীকৃতিও দেয় সার্ন। ২০০৩ সালে ইউরোপের এই গবেষণাগারেই ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামাঙ্কিত হিগস-বোসন কণা আবিষ্কার হয়।

● **উত্তর মেরুর তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি বাড়ল :**

সম্প্রতি একটি পর্যবেক্ষণে ড্যানিশ মেটেরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট (ডিএমআই)-এর পাশাপাশি ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর (নোয়া) আলাস্কা অঞ্চলের ক্লাইমেট সায়েন্স অ্যান্ড সার্ভিস ম্যানেজার রিক থোমান, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সুমেরু গবেষক জ্যাক ল্যাবে, নিউ জার্সির রটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সুমেরু বিশেষজ্ঞ জেনিফার ফ্রান্সিস-এর মতো বিজ্ঞানীরা জানান, স্বাভাবিকের থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ ৩৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা বেড়েছে উত্তর সাগরে; অন্যান্য বছরের শীত মরশুমের চেয়ে এবারের শীতে নাকি অনেক বেশি উত্তপ্ত উত্তর মেরু।

● **২১ শতকের সবচেয়ে বড়, উজ্জ্বলতম চাঁদ :**

গত ১৪ নভেম্বর দেখা গেল সুপার মুন তথা এই একুশ শতকের সবচেয়ে বড়ো আর উজ্জ্বলতম চাঁদ। সৌর পরিবারের গ্রহ পৃথিবী আর পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের গড় দূরত্ব ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার। তা এদিন ২৭ হাজার ৮৮৯ কিলোমিটার কমে হয় তিন লক্ষ ৫৬ হাজার ৫১১ কিলোমিটার। কোনও পূর্ণিমার দিনে পৃথিবী ও চাঁদকে এত কাছে শেষ দেখা গিয়েছিল প্রায় ৬৯ বছর আগে—দূরত্ব কমেছিল সেইবার ২৭ হাজার ৯৩৮ কিলোমিটার। কক্ষপথে ঘুরতে-ফিরতে চাঁদের এই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসার দূরত্বটিকেই বলা হয় 'পেরিজি'। তখনই হয় সুপার মুন। ওই সময় পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব থাকে ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৯০ মাইল বা ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটারেরও কম। সবচেয়ে দূরে গেলে সেই দূরত্বকে বলা হয় 'অ্যাপোজি'। ১৯৪৮ সালের পর এত বড়ো আর এতটা উজ্জ্বল চাঁদ আর দেখা যায়নি আকাশে। পূর্ণিমার চাঁদ যতটা বড়ো দেখায় তার চেয়ে ১৪ শতাংশ বেশি বড়ো দেখা যায় এবারের সুপার মুনকে। আর তার উজ্জ্বলতা সাধারণ পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশি। ২০৩৪ সালের ২৫ নভেম্বর আবার একটি সুপার মুন হবে। কিন্তু তখন চাঁদ এবারের মতো অতটা কাছে আসবে না পৃথিবীর।

● **নতুন সাত কার্সিনোজেনিক-এর খোঁজ :**

মার্কিন সংস্থা 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল হেল্‌থ সায়েন্সেস' (এনআইএইচ)-এর 'ন্যাশনাল টক্সিকোলজি প্রোগ্রাম'-এর 'কার্সিনোজেন' সংক্রান্ত ১৪তম রিপোর্ট (আরওসি) প্রকাশিত হয় গত ৩ নভেম্বর। এর ভিত্তিতে ক্যান্সারের সম্ভাব্য স্রষ্টাদের (কার্সিনোজেনিক) তালিকায় সাতটি নতুন নাম জোড়ে আমেরিকার 'ডিপার্টমেন্ট অফ হেল্‌থ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস'। এর মধ্যে আছে পাঁচটি ভাইরাস—মানুষের শরীরে থাকা 'টি-সেল লিম্ফোট্রোপিক ভাইরাস টাইপ-ওয়ান', 'এপস্টিন-বার ভাইরাস', 'কাপোসি সারকোমা-অ্যাসোসিয়েটেড হার্পস-ভাইরাস', 'মার্কেল সেল পলিওমা ভাইরাস' এবং 'হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস টাইপ-ওয়ান' (এইচআইভি-ওয়ান)। আর বাকি দু'টির একটি হল রাসায়নিক মৌল কোবাল্ট ও তার কয়েকটি যৌগ আর অন্যটি একটি জৈব-যৌগ-'ট্রাইক্লোরোইথিলিন'। এর ফলে, মার্কিন তালিকায় ক্যান্সারের সম্ভাব্য 'কারিগর'-এর সংখ্যা বেড়ে হল ২৪৮। সেই সাতটি নতুন নামের তালিকাটি তুলে দেওয়া হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র হাতে।

প্রয়াণ

● **জুঙ্কো তাবেই :**

গত ২০ অক্টোবর জাপানের সাইতামা শহরে মৃত্যু হয় মাউন্ট এভারেস্ট ও সপ্তশৃঙ্গ জয়ী বিশ্বের প্রথম মহিলা জুঙ্কো তাবেই-এর। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭। চার বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন এই পর্বতারোহী। ১৯৩৯ সালে জাপানের ফুকুশিমার ছোট পাহাড়ি শহর মিহারুতে জন্ম। মাউন্ট নাসুতেই প্রথম পর্বতে ওঠা। ১৯৭৫ সালে ৩৫ বছর বয়সে বিশ্বের প্রথম মহিলা হিসাবে এভারেস্ট জয় করেন জুঙ্কো তাবেই। ১৯৯২-এর মধ্যে সপ্তশৃঙ্গ জয় করেন। তিনি শেষবার মাউন্ট ফুজিতে ওঠেন ২০১১ সালে। সত্তরের দশকে জাপানে চিরাচরিত প্রথা ভেঙে মহিলাদের বেরিয়ে আসার পথ দেখান এই পর্বতারোহী। প্রচলিত ধারণা ভেঙে দিয়ে জুঙ্কো তাবেই ৭০-টিরও বেশি দেশে উচ্চতম শৃঙ্গগুলি জয় করেন। ১৯৬৯ সালে লেজিড ক্লাইম্বিং ক্লাব তৈরি করেন।

● **ফাদার পল দ্যতিয়েন :**

গত ৩১ অক্টোবর বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ফাদার পল দ্যতিয়েন। বাংলা ভাষাপ্রেমী দ্যতিয়েনের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। ১৯২৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর বেলজিয়ামের রশফর শহরে জন্ম দ্যতিয়েনের। ১৯৪৪ সাল নাগাদ 'সোসাইটি অফ জেসাস'-এ শুরু করেন ধর্ম জীবন। সেই সংগঠনের কাজেই ১৯৪৯ সালে আসেন ভারতে। এ দেশে আসার আগেই শুরু করেন সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শেখা। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পাশাপাশি পড়ান সুন্দরবনের বাসন্তীতে বাংলা মাধ্যমের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলেও। দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তার 'ডায়েরির ছেঁড়াপাতা' শীর্ষক কলাম। পরবর্তীকালে এই লেখার সংকলন বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। ১৯৭১-'৭২ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংহ দাস পুরস্কার' পান। 'আটপৌরে দিনপঞ্জি', 'রোজনামচা' প্রভৃতি রচনা ও 'গদ্য সংগ্রহ' সংকলনের পাশাপাশি অষ্টাদশ শতকের

মিশনারি উইলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা' পুনরুদ্ধার করেন। এছাড়া আরও অনেক অনুবাদও করেন তিনি। পরবর্তীকালে বেলজিয়াম ফিরে লেখালেখির পাশাপাসি গ্রন্থ সমালোচক হিসাবেও কাজ করেন। ২০১০ সালে তাকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার'-এ ভূষিত করে।

● **লেনার্ড কোহেন :**

গত ৭ নভেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসে নিজের বাড়িতে মারা গেলেন প্রবাদপ্রতিম কানাডীয় গায়ক-কবি লেনার্ড কোহেন (৮২)। ১৯৩৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কিউবেকের ওয়েস্টমাউন্টে জন্ম 'হ্যালেলুইয়া'-খ্যাত এই কিংবদন্তি কবি, গীতিকার, শিল্পীর। কিশোর বয়সেই গীটার বাজানো শিখে তৈরি করেন লোকসংগীতের দল 'বাকস্কিন বয়েজ'। স্প্যানিশ লেখক ফ্রেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার সংস্পর্শে এসে কবিতা ভালবেসে ফেলেন। ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক হওয়ার পর বাবার গ্রিক আইল্যান্ড হাইড্রায় থাকতে শুরু করেন লিওনার্দ। সেখানেই প্রকাশ করেন প্রথম কবিতার সংকলন ফ্লাওয়ারস ফর হিটলার (১৯৬৪) এবং দ্য ফেভারিট গেম (১৯৬৩) ও বিউটিফুল লুজারস (১৯৬৬) উপন্যাস দু'টি। মন্ট্রিয়লের কাপড়ের কারখানায় কাজ আর বই বিক্রি না হওয়ায় হতাশায় ১৯৬৬ সালে নিউ ইয়র্ক পাড়ি দেন কোহেন। আলাপ হয় লোকসংগীত গায়ক জুডি কলিনসের সঙ্গে। নিজের অ্যালবাম 'ইন মাই লাইফ'-এ কোহেনের লেখা দু'টো গান সংযোজন করেন কলিনস। এই দুটোর মধ্যেই ছিল কোহেনের প্রথম সাড়া জাগানো গান 'সুজানে'। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় কোহেনের প্রথম অ্যালবাম 'সংগ্স অফ লেনার্ড কোহেন'। এর পর একের পর এক অ্যালবাম—'সংগ্স ফ্রম আ রুম' (১৯৬৯), 'সংগ্স অফ লাভ অ্যান্ড হেট' (১৯৭১) এবং 'ডেথ অফ আ লেডিসম্যান' (১৯৭৭) তাকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছে দেয়। মাঝখানে অনেক দিন চুপ থাকার পর ফিরে আসেন এই শতকের গোড়ায়। ২০০১ সালে প্রকাশিত হয় 'টেন নিউ সংগ্স'। তার পর আরও চারটি অ্যালবাম। তার শেষ অ্যালবাম 'ইউ ওয়ান্ট ইট ডার্কার' বেরিয়েছে মৃত্যুর মাত্র তিন সপ্তাহ আগে।

● **শ্যারন জোন্স :**

গত ১৮ নভেম্বর মারা গেলেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্যারন ল্যাফায়ে জোনস। দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াইয়ের পর নিউ ইয়র্কের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬০। ১৯৫৬ সালে সাউথ ক্যারোলিনার নর্থ অগাস্টায় তার জন্ম। পরে অবশ্য ব্রুকলিন চলে আসেন। প্রথম জীবনে গানের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ ছিল না তার। চল্লিশে গানের জগতে আত্মপ্রকাশ 'কুইন অফ ফাঙ্ক' শ্যারনের। ১৯৯৬-এ 'সুইচব্লেড' তাকে প্রথম পরিচিতি দেয়। পরবর্তীকালে 'শ্যারন জোনস অ্যান্ড দা ড্যাপ-কিংস' ব্যান্ড তৈরির পর তাদের প্রথম অ্যালবাম 'ড্যাপ-ডিপিন'। অল্পদিনেই সঙ্গীতপ্রেমীদের নজর কাড়ে তারা। ড্যাপ-কিং-এর জনপ্রিয় অ্যালবামগুলির মধ্যে অন্যতম 'ন্যাচারালি', 'হান্ড্রেড ডেজ, হান্ড্রেড নাইটস', 'আই লার্নড দ্য হার্ড ওয়ে' ইত্যাদি। ২০০৭ সালে 'দ্য গ্রেট ডিবেটারস' ছবিতে 'দ্যটস হোয়াট মাই বেবি লাইকস' গানের সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোটো ভূমিকায় অভিনয় করতেও দেখা যায় শ্যারনকে। ২০১৪ সালে শ্যারন জোনস 'গিভ দ্য পিপল হোয়াট দে ওয়ান্ট'-এর জন্য গ্র্যামি মনোনয়ন পান।

খেলা

- **সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের মহিলা ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসে। গত ১০-২২ নভেম্বর তিনটি করে একদিবসীয় (২০১৪-'১৬ আইসিসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ানশিপের অঙ্গ হিসাবে) ও টি-২০ ম্যাচ খেলা হয় এই দুই দেশের মধ্যে। ৩-০-এ ভারত একদিবসীয় সিরিজ জেতে আর ৩-০-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজের দল টি-২০-তে জয়ী হয়।**
- **গত ২১ নভেম্বর হরিয়ানার লাহলিতে চৌধুরী বংশী লাল স্টেডিয়ামে ৪০০তম প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ তথা ৩৯৬তম রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ খেলতে নামে বাংলা দল।**
- **সন্তোষ ট্রফির পূর্বাঞ্চল জোনের খেলা শুরু হবে ১৮ ডিসেম্বর।**

● **কবাডি বিশ্বকাপে ভারতের জয় :**

আরও একবার কবাডি বিশ্বকাপ ভারতের হাতে। এর আগে দু' ধরনের ফর্ম্যাট মিলিয়ে সাতবার কবাডির বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত। গত ২২ অক্টোবর আমদাবাদের দ্য এরিনায় ফাইনালে প্রথমে এগিয়ে যায় ইরান। বিরতিতে ১৩-১৮। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ান অনুপ কুমাররা। রীতিমতো হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর খেলার ফল ভারতের পক্ষে ৩৮-২৯। মোট আটবার কবাডি বিশ্বকাপ হয়েছে। আটবারই চ্যাম্পিয়ন ভারত। কবাডি বিশ্বকাপ দু'টো ফর্ম্যাটে হয়—স্ট্যান্ডার্ড স্টাইল এবং সার্কল স্টাইল। এবার স্ট্যান্ডার্ড স্টাইলেই চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। মোট তিনবার এই ফর্ম্যাটে খেলা হয়। তাতে তিনবারই ফাইনালে ভারত-ইরান মুখোমুখি হয়।

● **চিনে কেরিয়ারের প্রথম সুপার সিরিজ জয় সিন্ধুর :**

গত ২০ নভেম্বর চিনের ফুকৌ শহরে পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু জেতেন তার জীবনের প্রথম সুপার সিরিজ খেতাব। চিন ওপেন চ্যাম্পিয়ন হন। সেমিফাইনালে কোরিয়ার সুং জি হিউনের বিরুদ্ধে প্রথম গেম হেরেও শেষ দু'টোয় বিপক্ষকে ২১ আর ১৯ পয়েন্টে আটকে ফাইনালে ওঠেন। সুন ইউ-এর স্থানীয় চিনা চ্যালেঞ্জকে বশ মানালেন ২১-১১, ১৭-২১, ২১-১১। প্রসঙ্গত, তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। এর আগে সাইনা নেহওয়াল আর কিদম্বি শ্রীকান্ত একই বছরে (২০১৪) চিন ওপেন জেতেন। আর তারও আগে ২০১৩ সালে গুয়াংঝৌয়ে মাত্র আঠারো বছরের সিন্ধু প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে সিঙ্গলসে পদক (ব্রোঞ্জ) জয় করেন। অবশ্য, রিও থেকে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ১১৬ বছরের ইতিহাসে প্রথম অলিম্পিক্স রুপো নিয়ে আসার পরে কোর্টে ফিরে পর পর দু'টো টুর্নামেন্ট ডেনমার্ক আর ফরাসি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে একই চিনা প্লেয়ারের

কাছে হেরে ছিটকে যান সিন্ধু। এবার বিশ্ব র‍্যাংকিং ফের প্রথম দশে চলে এলেন তিনি।

● **ব্যাডমিন্টন লিগ-এর নিলাম :**

ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশান অফ ইন্ডিয়া ২০১৩ সালে 'ইন্ডিয়ান ব্যাডমিন্টন লিগ' (আইবিএল)-এর সূচনা করে। ২০১৬ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় 'প্রিমিয়ার ব্যাডমিন্টন লিগ' (পিবিএল)। বছরের গোড়ায় ২ থেকে ১৭ জানুয়ারি পিবিএল-এর সাম্প্রতিকতম আসরের ফাইনালে মুম্বাই রকেটস-কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয় দিল্লি এসার্স দল। আগামী প্রতিযোগিতার জন্য দল বাছাই করতে গত ৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নিলাম।

বিদেশিদের সেরা তিন—

- ক্যারোলিনা মারিন (স্পেন) ৬১.৫ লক্ষ টাকা—হায়দরাবাদ হান্টার্স
- সুং জি হিউন (দক্ষিণ কোরিয়া) ৬০ লক্ষ টাকা—মুম্বই রকেটস
- ইয়ান ও ইয়র্গেনসেন (ডেনমার্ক) ৫৯ লক্ষ—দিল্লি এসার্স

ভারতের সেরা তিন—

- কিদাম্বি শ্রীকান্ত ৫১ লক্ষ—আওয়াধি ওয়ারিয়র্স
- পিভি সিন্ধু ৩৯ লক্ষ—চেন্নাই স্ম্যাশার্স
- সাইনা নেহওয়াল ৩৩ লক্ষ—আওয়াধি ওয়ারিয়র্স

● **রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড :**

গত ৮ নভেম্বর তিরুবনন্তপুরমের কেসিএ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দ্রুততম সেঞ্চুরি করে দিল্লির ঋষভ পন্থ রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে শুধু নয় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস লিখে ফেলেন। ৪৮ বলে করেন ১০০ রান। ১৩৫ রান করে যখন আউট হলেন তখন খেলেছেন মাত্র ৬৭ বল। ১৩-টি ওভার বাউন্ডারি ও ৮-টি বাউন্ডারি। ৪৮ বলে দ্রুততম সেঞ্চুরির মধ্যে ছিল ৬-টি বাউন্ডারি ও ১০-টি ওভার বাউন্ডারি। এর আগে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল ১৯৮৮-তে ভিবি চন্দ্রশেখরের। ৫৬ বলে ১০০ রান করেছিলেন। গত মরসুমে নমন ওঝা ৬৯ বলে সেঞ্চুরি করেন।

● **হকি ইন্ডিয়া লিগের নিলাম :**

২০১৭ হকি ইন্ডিয়া লিগের সব থেকে দামী প্লেয়ার গুরবাজ সিংহ। উল্লেখ্য, বেলজিয়ামে হকি ওয়ার্ল্ড লিগের সেমিফাইনাল চলাকালীন সুনির্দিষ্ট অভিযোগে ২০১৫ সালের আগস্টে রাইট ফ্ল্যাঙ্কে খেলা এই তারকা হকি প্লেয়ারসে ন' মাসের জন্য নির্বাসিত করে হকি ইন্ডিয়া। তারপর আর ফেরানো হয়নি জাতীয় দলে। পরের হকি ইন্ডিয়া লিগে গুররাজ খেলবেন রাঁচি রেসের হয়ে। ২০১৫ সালের চ্যাম্পিয়ন দল রাঁচি। গুরবাজকে তারা কিনে নেয় ৬৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায়। বিদেশিদের মধ্যে সব থেকে দামী জার্মানির ক্রিস্টোফার রুর। তাকেও ৫০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকায় কিনে নেয় রাঁচি রেসই। এছাড়া বিদেশিদের মধ্যে বড়ো টাকায় বিক্রি হলেন কলিঙ্গ ল্যান্সার্সে টম ক্রেইগ, পাঞ্জাব ওরিয়র্সে রবার্ট ফান দার হোর্স্ট ও উত্তরপ্রদেশ উইজার্ডে সেভে ফান আস। ভারতীয় জুনিয়ারদের মধ্যে সব থেকে বেশি দামে বিক্রি হলেন ১৮ বছরের হার্দিক সিংহ। তাকে ২৬ লক্ষ ৫১ হাজারে কিনে নিল পাঞ্জাব ওরিয়র্স। হকি ইন্ডিয়া লিগের ছ'টি ফ্র্যাঞ্চাইজি দাবাং মুম্বই, দিল্লি ওয়েভরাইডার্স, পাঞ্জাব ওরিয়র্স, কলিঙ্গ ল্যান্সার্স, রাঁচি রেস ও উত্তরপ্রদেশ উইজার্ড। পঞ্চম মরসুম শুরু হবে আগামী বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি নাগাদ।

● **ডোপিং-এর জন্য আট বছরের নির্বাসন :**

গত জুলাইয়ে বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়ান গ্রাঁ প্রিতে ২০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড (২০.৪৫ সেকেন্ডে) করে অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন করেন ধরমবীর সিং। অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি ছিল ২০.৫০ সেকেন্ড। কিন্তু ডোপ পরীক্ষায় ধরা পড়ে যান এই রানার। এর আগে ২০১২ সালেও ন্যাশনাল ইন্টার-স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপের সময় ডোপিংয়ের দায়ে ধরা পড়েন তিনি। কিন্তু এত দীর্ঘ নির্বাসন হয়নি সেইবার। ২৭ বছরের এই স্প্রিন্টারকে এবার আট বছরের জন্য নির্বাসিত করে নাডা। নাডার তরফ থেকে ধরমবীর, আইএএএফ ও ওয়াডাকে জানিয়ে দেওয়া হয় এই সিদ্ধান্তের কথা।

● **চার দশক পরে টানা ছ'টি ম্যাচ ব্রাজিলের :**

১৯৬৯ সালের পর কোনও টুর্নামেন্টে এই প্রথমবার টানা ছ'টি ম্যাচ জিতল ব্রাজিল। এই ছয় ম্যাচে এক গোল হজম করতে হলেও তিতের ব্রাজিল গোল করে ১৯-টি। ব্রাজিলের জার্সিতে প্রাক্-বিশ্বকাপের লড়াইয়ে পেরুর বিরুদ্ধে শততম ম্যাচটা জেতেন দানি আলভেজ। এই ছ' ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতেই গোল করে পেলের দেশে ইতিমধ্যেই হইচই ফেলে দেন ব্রাজিলের নয়া গোলমেশিন গ্যাব্রিয়েল জেসুস। জানুয়ারিতেই যিনি যোগ দিচ্ছেন পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে। নিট ফল— আর্জেন্তিনাকে ঘরের মাঠে চূর্ণ করার পর অ্যাওয়ে ম্যাচে পেরুকে ২-০ হারিয়ে দ্বাদশ রাউন্ডের পর দশ দলের লাতিন আমেরিকা গ্রুপ ২৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রইল ব্রাজিল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা উরুগুয়ের থেকে এই মুহূর্তে চার পয়েন্ট এগিয়ে নেইমাররা।

● **এক নম্বরে অ্যান্ডি মারে :**

টেনিস বিশ্বের এক নম্বর হলেন অ্যান্ডি মারে। টানা ১২২ সপ্তাহ শীর্ষে থাকার পর পতন হয় নোভাক জকোভিচের। প্যারিস মাস্টার্সে মারিন চিলিচের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে জকোভিচ হারার সঙ্গে সঙ্গেই মারের এক নম্বর হওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়ে। ফাইনালে পৌঁছলেই ব্রিটিশ তারকার সিংহাসন নিশ্চিত, এই অবস্থায় চোটের কারণে সেমিফাইনাল থেকে সরে দাঁড়ান মারের প্রতিপক্ষ, কানাডার মিলোসরাওনিচ। ফলে মারে সরাসরি চলে যান ৬ নভেম্বরের ফাইনালে। খেতাবের লড়াইয়ে তার প্রতিপক্ষ জন ইসনারকে হারিয়ে দেন। ১৯৭৩ সালে কম্পিউটার র‍্যাঙ্কিং চালু হওয়ার পর মারেই প্রথম ব্রিটিশ টেনিস তারকা যিনি সিঙ্গলসে এক নম্বরের আসনে বসেন। ৭ নভেম্বর এটিপি-র র‍্যাঙ্কিং তালিকা প্রকাশ হলে সরকারিভাবে এক নম্বরের মসনদের দখল নেন মারে।

● **হকিতে এশিয়ায় সর্বসেরা ভারত :**

গত ৩০ নভেম্বর মালয়েশিয়ার কুয়ান্তনে পি আর সৃজেশরা পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া চ্যাম্পিয়ন হন। তার এক সপ্তাহের মাথায় সিঙ্গাপুরে চিনকে হারিয়ে ভারতের মেয়েরাও হলেন এশিয়া

সেরা। মেয়েদের এশীয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি প্রথমবার মুঠোয় পুরে ইতিহাস গড়লেন সুশীলা চানু পুখরামবমরা।

একই টুর্নামেন্টে পাকিস্তানকে ফাইনাল-সহ দু'বার হারিয়ে ভারতে ট্রফি জয় করে। ফাইনাল ম্যাচে এই টুর্নামেন্টে ভারতের সেরা প্লেয়ার রুপিন্দর পাল সিংহের গোলেই দ্বিতীয় কোয়ার্টারের গোড়ায় ভারত এগিয়ে যায়। ২-০ করেন ইউসুফ আফান। কিন্তু ওই কোয়ার্টারেই আলিম বিলাল ১-১ করার পরের কোয়ার্টারে পাকিস্তানকে ০-২ থেকে ২-২ সমতায় ফেরান আলি শান। গ্রুপ লিগে পাকিস্তান ম্যাচে ভারত পিছিয়ে পড়েও শেষ কোয়ার্টারে (৫১ মিনিট) ভারতের হয়ে ৩-২ ফল করেন নিক্কিন থিমাইয়া।

মেয়েদের ফাইনালে তেরো মিনিটের মাথায় চিনকে প্রথম ধাক্কাটা দেন দীপ প্রেস এক্কা, পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে। চিন সমতা ফেরায় জং মেংলিংয়ের ফিল্ড গোলে। শেষ কোয়ার্টার পর্যন্ত ১-১ থাকা ম্যাচে একেবারে শেষের দিকে পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। ম্যাচের কুড়ি সেকেন্ড বাকি থাকতে ঐতিহাসিক জয় নিশ্চিত করেন স্ট্রাইকার দীপিকা। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার পাশাপাশি জয়ের গোল করে ফাইনালে ম্যাচের সেরাও হন। উল্লেখ্য, এশিয়ার সেরা পাঁচ মেয়েদের টিম চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া ও ভারতকে নিয়ে এই টুর্নামেন্টের লিগ পর্যায়ে ভারত হারে শুধুমাত্র চিনের কাছে। ২০১০-এ মেয়েদের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতের সেরা পারফরম্যান্স ছিল ২০১৩-য় ফাইনালে জাপানের কাছে হেরে রানার্স হওয়া। এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় একই সঙ্গে পুরুষ ও মেয়েদের এশিয়ার সেরার আসনে বসে নজির গড়ল ভারত।

● **টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ভারত :**

আইসিসি-র টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর জায়গাটা ধরে রাখল ভারত। ধরে রাখলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিনও। পয়লা নভেম্বর প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিং তালিকায় ১১৫ পয়েন্টে ভারত, পাকিস্তানের পয়েন্ট ১১১। তৃতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া (১০৮)। নিউজিল্যান্ড সিরিজে দুর্দান্ত ফর্মের দৌলতে দ্বিতীয় দ্রুততম বোলার হিসাবে ২০০ উইকেটে পৌঁছনো অশ্বিন বোলারদের তালিকায় এক নম্বরের সঙ্গে অলরাউন্ডারদের তালিকাতেও এক নম্বরে। অশ্বিনের বোলিং পার্টনার রবীন্দ্র জাডেজা বোলারদের তালিকায় সাতে, অলরাউন্ডারদের তালিকায় পাঁচে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সেরা ষষ্ঠ স্থানে থাকা অজিঙ্কিয়া রাহানে। এক ধাপ করে উন্নতি করে চেতেশ্বর পূজারা চোদ্দোতম এবং বিরাট কোহালি ষোলোতম স্থানে। এদিকে ইংল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করা স্পেলের দৌলতে অভিষেকেই সাড়া ফেলা বাংলাদেশি স্পিনার মেহেদি হাসান মিরাজ এক লাফে র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এসেছেন তেত্রিশ নম্বরে।

● **ইংল্যান্ডের বাংলাদেশ সফর :**

১২৯ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিলেন বাংলাদেশের ১৮ বছরের মেহেদি হাসান মিরাজ। অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসেই ছ' উইকেট নেন। ৩৯.৫ ওভার বল করে সাতটি মেডেন ও ৮০ রান দিয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে এসেছিল এক উইকেট। কিন্তু ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারতে হয় বাংলাদেশকে।

দ্বিতীয় টেস্টে বল হাতে একইভাবে শুরু করেন মিরাজ— আবারও প্রথম ইনিংসে ছ' উইকেট। ২৮ ওভারে দুটো মেডেন-সহ ৮২ রান। এবার অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসে আরও ছয় উইকেট। তিন ইনিংসে বল হাতে ছক্কা হাঁকিয়ে বিশ্বরেকর্ডেও নাম লিখিয়ে ফেলেন। অভিষেকে দুই টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেটের রেকর্ড করে। দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে জয়ের উইকেটটিও এল তারই বলে। এই প্রথমবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট জয় করল বাংলাদেশ। আর সেই ম্যাচের সেরা তো বটেই, সিরিজেরও সেরার শিরোপা উঠল মিরাজের মাথায়। এই একই ম্যাচে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে ১০ হাজার রান করে নতুন নজির গড়লেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক অ্যালিস্ট্যার কুক।

● **প্রথম সিকিম গোল্ড কাপ জয় মহমেডানের :**

গত ২৭ অক্টোবর গ্যাংটকে ৩৬তম সিকিম গোল্ড কাপের ফাইনালে মানবীর সিং-এর একমাত্র গোলে জিতল মহমেডান। হারিয়ে দিল নেপালের ঝাপা একাদশ এফসি-কে। ম্যাচ শুরুর ১৫ মিনিটের মধ্যেই গোল করে মহমেডানকে এগিয়ে দেন মানবীর। এর পর আর কেউই খাতা খুলতে পারেনি। ম্যাচের সেরাও হন মানবীর। উল্লেখ্য, এর আগে একাধিকবার রানার্স হয়েছে মহমেডান। সিকিম গভর্নস গোল্ড কাপের প্রথম বছরই মোহনবাগানের কাছে হেরে রানার্স হয়ে শেষ করতে হয় কলকাতার আর এক দল মহমেডানকে। এর পর চারবার রানার্সই হতে হয়। এই প্রথম চ্যাম্পিয়ন হল মহমেডান। ২০১৪ সালের আইএফএ শিল্ড জয়ের পর এর আগে আর চ্যাম্পিয়ন হয়নি মহমেডান।

● **যুব দক্ষিণ এশীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে ডাইভিংয়ে সোনা :**

কলম্বোয় যুব দক্ষিণ এশীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে ডাইভিং এবং স্প্রিং বোর্ডে সোনা-সহ জোড়া পদক জেতেন হুগলির মৌপ্রিয়া মিত্র। প্ল্যাটফর্ম ডাইভিংয়ে সোনা এবং তিন মিটার স্প্রিং বোর্ডে রুপো পান। অক্টোবরের ১৮ থেকে ২৩ আয়োজিত টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের অন্যতম ছিলেন হুগলি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মৌপ্রিয়া। সার্ক ভুক্ত সাত দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নেন কলম্বোয়। জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফল মৌপ্রিয়া। গত দু' বছর ধরে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় একের পর এক সাফল্য পান মৌপ্রিয়া চলতি বছরেই বেঙ্গালুরুতে জুনিয়র ন্যাশনাল অ্যাকোয়াটিক মিটে হাইবোর্ডে প্রথম, ৩ মিটার স্প্রিংবোর্ড দ্বিতীয় এবং এক মিটার স্প্রিংবোর্ডে তৃতীয় স্থান পান তিনি। ২০১৫ সালে পুনেতে একই প্রতিযোগিতায় এক মিটার স্প্রিংবোর্ডে দ্বিতীয় স্থান পান তিনি। অংশ নেন সিনিয়র ন্যাশনালেও।

● **ধোনির ন' হাজার রান :**

ন' হাজার রানের তালিকায় ঢুকে পড়লেন ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ছুঁয়ে ফেলেন ৯০০০ রান। শুধু পঞ্চম ভারতীয় হিসেবেই নয়, তৃতীয় উইকেট কিপার হিসেবেও একদিনের ম্যাচে এই রেকর্ড স্পর্শ করেন তিনি। ভারতীয়দের মধ্যে এই রান করা বাকি চার ব্যাটসম্যান—শচীন

তেণ্ডুলকর (১৮,৪২৬), সৌরভ গাঙ্গুলী (১১,৩৬৩), রাহুল দ্রাবিড় (১০,৮৮৯) ও মহম্মদ আজহারউদ্দিন (৯,৩৭৮)। বিশ্ব ক্রিকেটে উইকেটকিপারদের মধ্যে এর আগে ৯০০০ রান করেন শ্রীলঙ্কার কুমার সঙ্গাকারা (১৪,২৩৪) ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (৯,৬১৯)।

বিবিধ

● **আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার :**

এ বছরের আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার প্রাপক দুবাই প্রবাসী কিশোরী কেকাশন বসু। মাত্র আট বছর বয়সেই পরিবেশ রক্ষার জন্য লড়াই শুরু করে সে। এখন অন্তত দশটি দেশে তার সংস্থা 'গ্রিন হোপ'-এর খুদে স্বেচ্ছাসেবীরা কর্মরত। সেরা তিনের এই তালিকায় নাম রয়েছে ক্যামেরুন ও সিরিয়ার আরও দুই শিশুর। ১২০ জনের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া এই তিন জন বিজয়ীকে ২ ডিসেম্বর, ২০১৬-এ হেগের এক অনুষ্ঠানসভায় সম্মানিত করা হবে।

● **এয়ার ইন্ডিয়ার নজির :**

না থেমে একলপ্তে ১৫,১০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে নয়া নজির গড়ল এয়ার ইন্ডিয়া। সময় লাগে ১৫ ঘণ্টা। সাশ্রয় হয় ১৩ টন জ্বালানি। শুধু তাই নয়, দিল্লি থেকে সান ফ্রান্সিসকো এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ায় বিশ্বের দীর্ঘতম পথ পেরনোর পালকটিও যুক্ত হল এয়ার ইন্ডিয়ার মুকুটে। দিল্লি থেকে সান ফ্রান্সিসকো যাওয়ার যে পুরনো রাস্তা সেটি প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে যায়। কিন্তু এবার অ্যাটলান্টিকের উপর দিয়ে নতুন যে রাস্তাটিতে উড়ান চালানো হয়েছে, তাতে ১,৪০০ কিলোমিটার বেশি পথ অতিক্রম করতে হয়।❑

সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

জানেন কি ?

সূর্য-জ্যোতি

শহরের বস্তি বা গ্রামাঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, সেখানে কম খরচে আলো পৌঁছে দিতে 'সূর্য-জ্যোতি' (Photo-Voltaic Integrated Micro Solar Dome বা MSD) নামক শক্তি সাশ্রয়ী ল্যাম্প ব্যবহার করা হয়।

এই ল্যাম্প দিনের বেলা সংগ্রহ (Capture) করা সূর্যালোক একত্র (Concentrate) করে জমিয়ে (Save) রাখে যাতে তা রাতে ব্যবহার করা যায়। এই যন্ত্রটি Leak Proof এবং তা সূর্যাস্তের পর চার ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারে। Green Energy বা সবুজ শক্তি উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর এই যন্ত্রটি গড়ে তোলে।

শহর ও গ্রামাঞ্চলের ১ কোটি পরিবার, যাদের নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, তারা 'সূর্য-জ্যোতি' বাতি ব্যবহার করবে। এটি ৬০-ওয়াটের তাপোজ্জ্বল ল্যাম্পের সমান আলো দেয়। সে জন্য ১৭৫০ মিলিয়ন একক বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে এবং ১২.৫ মিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমণ কম হবে।

এই 'সূর্য-জ্যোতি' বাতি তিনভাবে কাজ করে—দিনের বেলা বিনা বিদ্যুতে, রাত্রি বেলায় সৌর PV-র সাহায্যে এবং সূর্যালোক ছাড়া ১৭ ঘণ্টা কাজ করার পর, প্রচলিত বিদ্যুতে। এই যন্ত্রের উৎপাদন প্রক্রিয়া শ্রম নিবিড় এবং আশা করা যায় যে এক্ষেত্রে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মাসিক উৎপাদন ৬ হাজার ল্যাম্প হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ২০১৭ সালের মার্চের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়াবে ২০ হাজার।

দিল্লি, কলকাতা, আগরতলা, গুয়াহাটি, ভোপাল ও বেঙ্গালুরুর বস্তি এলাকায় প্রায় এক হাজার ক্ষুদ্র সৌর্য গম্বুজ (MSD) কাজ করছে। Photo-Voltaic সমন্বিত ল্যাম্পের খরচ প্রায় ১২০০ টাকা আর তা ছাড়া এর মূল্য ৫০০ টাকা। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এর দাম যথাক্রমে কমে দাঁড়াবে ৯০০ টাকা ও ৪০০ টাকা। এই আলো Grid-বহির্ভূত সৌরশক্তি-নির্ভর প্রজ্বলন উপকরণ হিসেবে স্বীকৃত এবং সেই কারণে এর জন্য নানা সরকারি গ্রামীণ ও শহুরে প্রকল্পের আওতায় ভরতুকি দেওয়া হতে পারে।❑

সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা

দুর্নীতি ও কালো টাকার অবসান ঘটাতে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

দুর্নীতি, কালো টাকা, অর্থপাচার, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিদের অর্থ জোগানোর পাশাপাশি নকল নোটের অবসান ঘটাতে গত ৮ নভেম্বর ভারত সরকার Demonetization বা বিমুদ্রীকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই ব্যাপক পদক্ষেপ (সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে) প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করেন। জাতির উদ্দেশে তার এই বার্তায় তিনি জানান যে, ৫০০ ও ১,০০০ টাকার নোট বাতিল করা হল এবং এর পরিবর্তে নতুন ৫০০ ও ২,০০০ টাকার নোট জারি করা হচ্ছে।

এই কর্মকাণ্ডের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে ৫০০ ও ১,০০০ টাকার নোটের প্রচলন বন্ধ
- বৈধ থাকছে ১০০, ৫০, ২০, ১০, ৫, ২ ও ১ টাকার নোট
- রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র সুপারিশ অনুযায়ী ২,০০০ টাকার নোট ও নতুন ৫০০ টাকার নোট জারি
- ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরনো ৫০০ ও ১,০০০ টাকার নোট ব্যাংক ও ডাকঘরে জমা দেওয়া যাবে (কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই)
- ব্যাংক থেকে দিনে ১০,০০০ টাকা ও সপ্তাহে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত নগদ তোলা যাবে। (পরবর্তীকালে ১৪ নভেম্বর থেকে সাপ্তাহিক ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ২৪,০০০ টাকা করা হয় ; এবং দৈনিক সীমা বাতিল করা হয়।)
- ব্যাংক, হেড পোস্ট অফিস ও সাব পোস্ট অফিস-এ ৫০০ ও ১,০০০ টাকার পুরনো নোট বদলে নিতে বৈধ পরিচয়পত্র প্রয়োজন। ২০১৬-র ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত দৈনিক বিনিময়ের ঊর্ধ্বসীমা ৪,০০০ টাকা ছিল (পরে তা বাড়িয়ে ৪,৫০০ টাকা করা হয় এবং আবার তা কমিয়ে করা হয় ব্যক্তিপিছু ২,০০০ টাকা)
- ATM থেকে টাকা তোলার ঊর্ধ্বসীমা ২,০০০ টাকা (পরবর্তীকালে তা বাড়িয়ে ২,৫০০ টাকা করা হয়)
- নগদ বাদ দিয়ে Cheque, Demand Draft, Debit বা Credit Card ও Electronic Fund Transfer-এর মতো লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ নেই
- মানবিকতার খাতিরে ৫০০ ও ১,০০০ টাকার পুরনো নোট সরকারি হাসপাতাল, সরকারি হাসপাতালের ওষুধের দোকান (ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপ্শান-সহ), রেলের টিকিট কাউন্টার, সরকারি বাস, বিমানের টিকিট কাউন্টার, সরকারি ক্ষেত্রের তেল কোম্পানির পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসের পাম্প, রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত সমবায় বিপণি ও দুধের দোকান এবং শ্মশান ও কবরস্থানে গ্রহণ করা হয়
- নোট বিনিময় ব্যবস্থার অপব্যবহার রুখতে ও আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে নগদ তোলার সুযোগ দিতে পরবর্তীকালে (১৫ নভেম্বর) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে নির্বাচনে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের কালি (যা মুছে ফেলা যায় না) ব্যাংক ও ডাকঘরে ৫০০ ও ১,০০০ টাকার পুরনো নোট বদলানোর সময় ব্যবহার করা হবে।

গত ১৭ নভেম্বর সরকার নোট বাতিল সংক্রান্ত আরও কিছু নতুন নিয়ম ঘোষণা করে :

- পরিবারে বিয়ে উপলক্ষে যে কোনও একজন অভিভাবকের অ্যাকাউন্ট থেকে আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত তোলা যেতে পারে
- কৃষক অনুমোদিত ফসল ঋণ-বাবদ সপ্তাহে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবেন এবং নিজের অ্যাকাউন্ট-এ জমা দিতেন পারবেন
- কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা (নির্দিষ্ট শ্রেণী পর্যন্ত) নভেম্বর মাসের থেকে ১০,০০০ টাকা অবধি নগদ টাকা অগ্রিম হিসেবে পান

কালো টাকার শাপমোচনে সরকারের অবিরাম প্রচেষ্টারই অঙ্গ এই পদক্ষেপ। বর্তমান সরকারের সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত ছিল কালো টাকার সন্ধানে একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করা। ২০১৫ সালে গোপন বিদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত একটি আইন পাশ করা হয়। ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে বেনামি লেনদেন প্রতিরোধের জন্য কড়া নিয়ম-কানুন চালু করা হয়। এই একই সময়কালে কালো টাকা ঘোষণা সংক্রান্ত প্রকল্পেরও সূচনা হয়। ইতোমধ্যেই, গত আড়াই বছরে বেশ অনেকখানি কালো টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

(১৭ নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংকলিত)

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 30.00

December, 2016
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।